সোনার বাঙলার সোনার ছেলে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

পরিবেশক :

অনির্বাণ প্রকাশনী

৩এ গদাধরবাবু লেন

কলিকাতা-৭০০০[illegible]

প্রকাশক :
সমরেন্দু সরকার
জুপিটার পাবলিকেশনস্
৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

সহযোগিতায় : ইউ. বি. আই.

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়
কেচ/এন-মার্ক

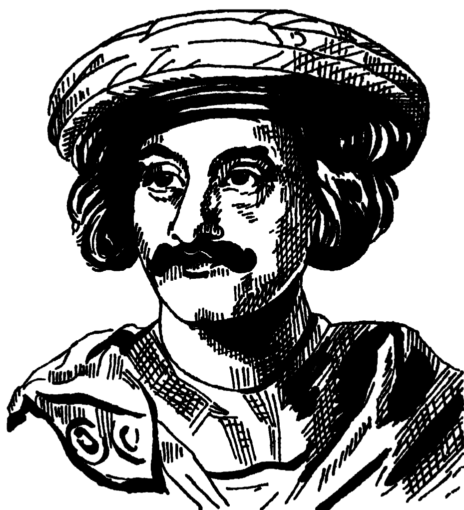
বিনয় বসু কর্তৃক
কিনিক্স প্রিন্টার্স
২, চোরবাগান লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭ থেকে মুদ্রিত

কিশোর বাঙালীর হাতে

সূচী :

রামমোহন রায়

নবীন ভারতের স্রষ্টা



মৃত স্বামীর জন্য চিতা সাজানো হয়েছে; সতীসাধ্বী স্ত্রী তাঁর চোখেমুখে স্বর্গীয় দীপ্তি নিয়ে সুন্দর সাজসজ্জা করে স্বামীর চিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছনে একদল সমাজপতি আর ব্রাহ্মণ। আর একদল লোকের হাতে ঢাক, ঢোল, দামামা! দেখতে দেখতে নানা শ্রেণীর লোক সেখানে জড় হলো, সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবার জন্যে! অনেক স্ত্রীলোকও আসছেন—সেই সতীর কানে কানে তাঁদের কেউ কেউ বলছেন, "স্বর্গে আমাদের যে সব আত্মীয় আছেন তাঁদের প্রণাম জানিয়ো, প্রীতি জানিয়ো, তুমিও সুখে থেকো..." ইত্যাদি।

তারপর চিতায় আগুন জ্বালানো হলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী-সাধ্বীকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দেখে—তার জ্বলন্ত সৌভাগ্যে অনেক মেয়ে ঈর্ষামিশ্রিত আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

ঠিক এই সময় একজন যুবক অদূরবর্তী পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ এই দৃশ্য চোখে পড়তেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এমন ঘটনার কথা তিনি তো আরও অনেক শুনেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু মনে কখনও তো এমন করে জিজ্ঞাসা জাগে নি যে, সভ্যজগতের মানুষ কি করে এমন নৃশংস ব্যবস্থার অনুমোদন করতে পারে, কেমন করে এই কুসংস্কারকে সহ্য করতে পারে?. যুবক এই সময় থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে ভাবেই হোক এই নিষ্ঠুর প্রথার মূলোচ্ছেদ করতেই হবে এবং তিনি এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই সেদিন গৃহে ফিরলেন।

এদিকে যে মেয়েটি স্বামীর চিতায় এইভাবে আত্মদান করলেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন অশেষ গৌরব বোধ করতে লাগলেন। সহমৃতা তরুণীর আর তাঁর পরিজনদের প্রশংসায় চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠলো। এই ছিল আগেকার সতীদাহ প্রথা। আর যে মেয়ে এইভাবে আত্মদান করতেন না, তাঁদের উপর সমাজ অমানুষিক উৎপীড়ন করতো। অন্নে ও বস্ত্রে তাঁদের নানাভাবে বঞ্চিত রাখা হতো। স্বামীর প্রতি তাঁরা অবিশ্বাসিনী বলে গণ্য হতেন।

অতি প্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে প্রচলিত এই সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা কোন কোন মনীষী ব্যক্তি যে উপলব্ধি করেন নি তা নয়, কিন্তু কেউই এই নির্মম কুসংস্কারের বিলোপ সাধনে কৃতকার্য হন নি। এমন কি, পূর্বে যে যুবকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর আগে এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে বাঙলায় তথা ভারতের কোথাও তেমন ব্যাপক আন্দোলন হয় নি। এই যুবকই পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের ঘুমন্ত

জাতিকে অক্লান্ত পরিশ্রমে জাগিয়ে তুললেন এবং এই প্রথার কদর্যতা ও নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করালেন। তিনিই প্রথম এই দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং একমাত্র তাঁরই অতুলনীয় প্রয়াস ও প্রচারের ফলে অবশেষে এই বর্বর সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। ইনিই মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায় শুধু যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন তাই নয়, দেশকে অন্যান্য আরও অনেক কুসংস্কারের কুফল থেকে মুক্ত করে তিনি এদেশে নবজাগরণ এনে দিয়েছেন।

আমরা আজ যে ভারতবর্ষে বাস কবছি, তা বিংশ শতাব্দীব ভারতবর্ষ। আজকের এই 'নব ভারতে' বসে আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, দু'শো বছর আগে এই দেশের অবস্থা কী ছিল। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার দিনে—উড়োজাহাজ আর কলের কামানের যুগে; মিল ও ফ্যাক্টরী, বিদ্যুৎ ও রসায়নের এবং সর্বোপরি পারমাণবিক অগ্রগতির যুগে;—অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দু'শো বছর আগেকার ভারতবর্ষের রূপ সম্বন্ধে ধারণা করাও এখন দুঃসাধ্য। তবে ইতিহাস পড়লে সে যুগের ছবি আমাদের চোখের সামনে খানিকটা ভেসে ওঠে।

রাজা রামমোহন বায় ভারতবর্ষের সেই 'অন্ধযুগে' ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার অধীন রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে সবেমাত্র ইংরেজ-শাসন স্থাপিত হয়েছে। নবাবী আমলের আদব-কায়দা তখনও দেশে প্রচলিত। শাসন-ব্যবস্থা এখনকার মত সুশৃঙ্খল তো হয়-ই নি বরং দেশে অবিচার-অত্যাচার সর্বক্ষণ লেগেই ছিল। তার উপর আবার সমাজে এমন সমস্ত রীতিনীতি ও চালচলন প্রচলিত ছিল যে, কোন লোকের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা তো দূরের কথা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং কথা বলাও সম্ভব ছিল না। কাজেই দেশের অবস্থা তখন যে কিরূপ শোচনীয় ছিল, তা সহজেই অনুমেয়

প্রত্যেক দেশের অধঃপতন ঠিক এমনি করেই আসে। লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি যখন লোপ পায়, স্পষ্টভাবে অধিকার দাবী করবার ক্ষমতা যখন আর থাকে না, তখন মানুষকে জড়পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। তার জীবন দুনিয়ার কোন কাজেই লাগে না—"ন দেবায় ন ধর্মায়"। লোহাকে আগুনে তাতিয়ে যেমন বিবিধ কার্যোপযোগী অস্ত্র তৈয়ারী হয়, মানুষকেও তেমনি শিক্ষিত করে আদর্শানুসরণে ও কর্মে প্রবৃত্ত করানো যায়। ভারতীয় জীবন তখন ঠিক লোহার মতই জড় পদার্থ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামমোহন যখন বাঙলার অখ্যাত, অজ্ঞাত এক পল্লীগ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙলায় তথা ভারতে চিন্তার এই দুর্ভিক্ষ সর্বত্র বিরাজমান ছিল। এই ক্ষয়রোগ সমাজদেহের মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই দেশের অবস্থা যে অত্যন্ত অধঃপতিত ছিল,—মূঢ়তা ও জড়তায় দেশ যে ছেয়ে গিয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে—অবাধ চিন্তা ও কর্মোদ্যমের যুগে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সাধনার ক্ষেত্রে—আমরা বর্তমান ভারত উপমহাদেশের স্রষ্টাকে মাঝে মাঝে ভুলে যাই;—ভুলে যাই সেই বিরাট প্রতিভাবান পুরুষকে—যিনি বিগত শতাব্দীর পূর্বেকার মুমূর্ষু পাণ্ডুর ভারতবর্ষে প্রথম প্রাণসঞ্চার করেছিলেন।

কি করে সেই ঘুমন্ত ভারতের নবজাগরণের সূচনা হলো, তা আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় ইতিহাস। রাজা রামমোহনের সমগ্র জীবন সেই নবজাগরণের ইতিহাসের প্রায় সমস্ত রসদই জুগিয়েছে। কাজেই রামমোহনের জীবনী অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম এক-তৃতীয়াংশে বাঙলার তথা ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেইজন্যেই রামমোহন নবীন ভারতের স্রষ্টা (maker of modern India)। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান ভারতে যে সব জনহিতকর কর্মপ্রচেষ্টা চলছে, রাজা

রামমোহনই হয় তা আরম্ভ করে গিয়েছেন, নয়, তিনি সে বিষয়ে দেশবাসীকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন ; সুতরাং আমরা যদি বলি,— আমরা একালে' বিজ্ঞানের রাজ্যে বাস করছি বটে, কিন্তু আজও আমরা রামমোহনের যুগেই আছি, তাতে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। কেন হয় না, তাঁর কর্ম ও চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করলেই আমরা তার সন্ধান পাব।

'রাজা'র জন্মের সময় যে তৎকালীন ভারত কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং মূঢ়তায় আচ্ছন্ন ছিল, তা আগেই বলেছি। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে তিনি কেবল এর বিরুদ্ধে দশজনের মত মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, স্বীয় বিশ্বাসকে আপন জীবনে কার্যকর করতে গিয়ে তিনি পদে পদে বিপদ বরণ করেছেন, অর্থকষ্ট ভোগ করেছেন, সমাজচ্যুত হয়েছেন, এমন কি জীবনকে সঙ্কটাপন্ন পর্যন্ত করেছেন। আজন্ম সুখে পালিত রামমোহন অভ্যস্ত জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে শিখলে হয়ত সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধন যাঁর জীবনব্রত, তিনি কেন সাধারণের মত সুখ-দুঃখে মুগ্ধ বা বিচলিত হয়ে পড়বেন? তিনি জয় করবার প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন। কাজেই চিরাচরিত অর্থহীন সংস্কারে তাঁর মন কখনও সায় দিতে পারে নি। বরং নব নব কর্মপ্রেরণায় সমস্ত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যুগের মহিমময় সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই একটু চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকেন। রামমোহনও শৈশবে অতি চঞ্চল ছিলেন। তখনকার দিনে আরবী ও ফারসী না শিখলে (যেমন আজকাল ইংরাজী) কোন শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হতো না। নয় বৎসর বয়সে রামমোহনও আরবী ও ফারসী শিখবার জন্য পাটনায় গেলেন। সামান্য কয়েক বছরে তিনি ইসলামী শাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত হয়ে

উঠলেন যে, শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানগণ পর্যন্ত তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলবী' নাম দিয়েছিলেন।

রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতা-মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ। কি চিন্তাক্ষেত্রে, কি ধর্মরাজ্যে, কি সমাজসংস্কারে, কি স্বাধীনতা আন্দোলনে, কি বিশ্বপ্রেমে, তিনি ছিলেন সকলের অগ্রদূত। বাল্যেই তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের স্ফুরণ হয় এবং তা অনুসরণ করতে গিয়ে দুঃখভোগ করবার শক্তিও তিনি লাভ করেন। অতি অল্প বয়সে যখন বাঙালীর ছেলে ঠাকুরমা-দিদিমার আঁচলের আড়ালে থাকে, ননী-মাখনও মুখে রোচে না, সামান্য কথা বা ব্যথায় কান্নাকাটি করে পাড়া মাথায় করে তোলে, সেই সুকুমার বয়সেই রামমোহন সত্যানুসন্ধিৎসায় পাগলের মত হয়ে স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠার জন্যে দুর্লঙ্ঘ্য হিমাচল পার হয়ে সুদূর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন। পাটনা থেকে ফিরে এসে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তিনি প্রবল যুক্তিতর্ক উপস্থিত করলেন। আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হলো; সহ্য করতে না পেরে স্নেহপ্রবণ বাবাও তাঁকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করলেন। ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু রামমোহন তিব্বতের দুরধিগম্য হিমশীতল প্রদেশে সহস্র সহস্র মাইল পদব্রজে চার বছর ঘুরে বেড়ালেন।

শুধু তাই নয়। যে হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন যুদ্ধ করে গিয়েছেন, তার মর্ম অনুসন্ধানের জন্যে সে কী কঠোর শ্রম! বারাণসীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি হিন্দু-ধর্মের সর্বজনীনতা ও একেশ্বরবাদিতা প্রমাণিত করেন। আবার খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝবার জন্যে তিনি মূল বাইবেল গ্রন্থ হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অধ্যয়ন ও অনুশীলন করলেন। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা যখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে লাগলেন, তখন কোনও হিন্দু নেতাই যা পারেন নি, রামমোহন তাই করলেন,—নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণে ও যুক্তিবাণে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করেই তিনি

ক্ষান্ত হলেন না, হিন্দুধর্মের সর্বজনীনতাও প্রমাণিত করলেন। তাই বলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি। খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁকে "অদীক্ষিত খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক" বলতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

বস্তুতঃ সত্যানুসন্ধিৎসাই রামমোহনের ধর্মজীবনের মূলমন্ত্র; এতেই তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, এই তিন শ্রেষ্ঠ ধর্মের সার সংগ্রহ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যেক ধর্মের ঈশ্বর এক ও অভিন্ন এবং এর উপর ভিত্তি করেই তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্মে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই, এখানে পরমব্রহ্মের উপাসনাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং মুক্তিলাভের উপায়। ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের উদারতা এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

কেবলমাত্র ধর্ম সম্বন্ধেই রামমোহন স্বাধীন মতের প্রতিষ্ঠা করেন নি। সব বিষয়েই তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল। সত্যানুভূতি তাঁকে দেশের দুর্দশায় পাগল করে তুলেছিল। তিনি জানতেন,—হিন্দুর পতনের মূল কারণ কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও মূঢ়তা। তাই তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। একবার তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন,—"আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, হিন্দুদের আচরিত ধর্ম তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক-স্বরূপ। আমার মনে হয়, এই ধর্মের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ রাজনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক শান্তির জন্য ইহা আবশ্যক।" বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই উক্তির যাথার্থ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবেন।

কেবলমাত্র পথনির্দেশ করেই রামমোহন ক্ষান্ত হন নি; সব বাধা অগ্রাহ্য করে নতুন পথে অগ্রসর হবার সাহস তাঁর ছিল। কি সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে, কি হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে অধিকার ব্যাপারে, কি বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে, কি কন্যাপণ নিবারণে, কি

জাতিভেদ প্রথার কুফল দূরীকরণে—এমনি বহু ব্যাপারেই তিনি আজীবন আন্দোলন করে গিয়েছেন।

রামমোহন জানতেন যে, ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের সাফল্য অনেকাংশে সুশিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, স্বদেশের উন্নতি প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকলেই আসবে না; তার উন্নতি নির্ভর করবে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সাধনার উপর। মানুষের মন যদি উদার হয়, সুশিক্ষা যদি সে পায়, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা যদি তার জন্মে, তবে কুসংস্কার ও মূঢ়তা তার উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না, তার উন্নয়ন অনিবার্য। সেইজন্যে যখন প্রাচ্যশিক্ষা বনাম পাশ্চাত্যশিক্ষা নিয়ে বিষম বিরোধের সৃষ্টি হলো, তখন রামমোহন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান-প্রথাকে সমর্থন করলেন। লর্ড আমহার্স্ট সংস্কৃত শিক্ষার আয়োজন করলে তিনি বলেছিলেন—"গভর্ণমেণ্ট যদি এই দেশবাসীর যথার্থ কল্যাণসাধনে অভিলাষী হইয়া থাকেন তাহা হইলে যেরূপ উদার ও উন্নত শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত হইলে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে সেরূপ শিক্ষা প্রবর্তন করুন।" এক কথায় বলা চলে, তাঁর প্রাণপাত আন্দোলনের ফলেই আজ দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ হয়েছে। যদি তখন পাশ্চাত্যশিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ না করতো তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পৃথিবীর মধ্যে ভারত যে সামান্য প্রতিষ্ঠাও অর্জন করতে পেরেছে, তাও এতদিনে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাই বলে তিনি স্বদেশের প্রাচীন বিদ্যাকেও অবহেলা করেন নি।

ভারতের উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা। কিশোর বয়সেই রামমোহন তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কথিত আছে, মুখ্যতঃ ইংরেজ-শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তিনি তিব্বত যাত্রা করেন; পরে অবশ্য তাঁর মতামত কিছু পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আমৃত্যু তিনি বিশ্বাস করতেন যে,

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়া উচিত। যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, কি এদেশে কি বিলাতে, ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সর্বত্রই প্রচার করেছেন।

সকলেই জানেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূলভিত্তি। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রথমভাগেই ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। তখন রামমোহন এর প্রতিবাদে তাঁর সম্পাদিত কাগজ 'মিরাট-আল-আখবারের' প্রকাশ স্বেচ্ছায় বন্ধ কবে দেন। তিনি পার্লামেণ্টে পর্যন্ত এর প্রতিবাদ কবেছিলেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি।

চিবস্থায়ী বন্দোবস্তেব প্রতিবাদ করে একদা তিনি বলেছিলেন—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের ভূস্বামীদেব সম্পদ বাড়াইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা দরিদ্র কৃষকের কোনও উন্নতি হয নাই।" শতাধিক বছর আগেই যিনি দেশেব অবস্থা মানসনেত্রে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি তো ঋষি ছাড়া আর কিছুই নন! সেইজন্যই তিনি নব্য-ভারতের গুরু।

নিজ দেশের পবাধীনতাব জন্য তিনি যত বেদনা পেতেন, পৃথিবীর যে কোনও পবপদানত দেশের সম্বন্ধেই একই রকম ব্যথা অনুভব করতেন। নেপলসবাসীবা স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজিত হলে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আবার স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হলে আনন্দের আতিশয্যে কলকাতা টাউন হলে তিনি এক বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন। বিলেত যাত্রার সময় ফরাসী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা শুনে নিজের শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আগ্রহের সঙ্গে তিনি এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন: "Glory, Glory to France."

রিফর্ম বিল আন্দোলনকে উপলক্ষ করে তিনি বলেছিলেন—"ইহাকে কেবল সংস্কারকামী ও প্রাচীনপন্থীদের সংগ্রাম বলিলে চলিবে না। ইহা স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতার

সংগ্রাম। ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের সংগ্রাম।”

এই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ চিরজীবন যুদ্ধ করেই গিয়েছেন—সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সর্বত্রই নির্ভীকভাবে জীবন বিপন্ন করেও একাকী সংগ্রাম করেছেন। বিলেতে গিয়েও সে প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। সেইজন্য অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিস্টল শহরে জ্বরাক্রান্ত হয়ে এই লোকোত্তর প্রতিভাশালী নরকেশরীর দেহাবসান ঘটে।

রাজা রামমোহনের নশ্বর দেহের মৃত্যু হয়েছে বটে কিন্তু তাঁর আত্মা সমস্ত প্রগতিশীল ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেইজন্যই তিনি অমর—তাঁর নশ্বর দেহাবসান পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধ রচনা করেছে, মৃত্যুভীত ভারতীয়দের জীবনে অবিরাম জাগরণের বন্দনাবাণী শোনাচ্ছে। বলছে,—

“আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।”

মানবধর্মী বাউলকবি

লালন ফকির



একজন খাঁটি মানুষ বলতে যা বুঝায় তিনি ছিলেন তাই। এমন মানুষকে কোনো বিশেষ ধর্মীয় নামে অভিহিত করা যায় না। অথচ এক অর্থে তিনি সকল ধর্মেরই অর্থাৎ তিনি ছিলেন মানবধর্মী। সব ধর্মের, সব দেশের, সব মানুষকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখতেন। এমনি উদার মনোভাব যে মহামানব লালন করতেন মনে মনে, লালন ফকির নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন দেশের মানুষের কাছে।

জন্মেছিলেন লালন ফকির যশোহর জেলার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে। আর তাঁর সাধন জীবন কেটেছে কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী

পল্লী ছেউড়িয়ায়। 'ছায়া ঘেরা মায়ায় ভরা' এই ছেউড়িয়া যেমন লালন ফকিরকে প্রভাবিত করেছিল তেমনি ঐ গ্রামের অধিবাসীরাও আত্মহারা হয়ে যেতেন লালনের গান শুনতে শুনতে। ক্রমে ক্রমে গোটা জেলা এমন কি আশপাশের জেলাগুলিতেও এই মানব-সাধকের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

লোকসঙ্গীতের রাজ্য যশোহর-কুষ্টিয়া। শুধু লালন শাহই নয়, এ অঞ্চলে জন্মেছিলেন পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই গোপাল; সিরাজ সাঁই এবং দাদ আলি প্রমুখ ভাবসঙ্গীত-শিল্পী সিদ্ধ সাধকেরা। এঁরা গানে গানে ঈশ্বরপ্রেমে ও মানব-প্রেমে মাতিয়ে তুলেছিলেন এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে।

এমন কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন লালন ফকির। কবিগুরু যুব বয়সে যখন শিলাইদহে ঠাকুর বাড়ীর কুঠীতে অবস্থান করছিলেন, সে সময়েই তিনি অতিবৃদ্ধ ঐ মহান ফকিরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। গভীর শ্রদ্ধায় তিনি তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে লালন ফকির এবং তাঁর গানের অবদান অপরিসীম।

লালন শাহের জন্ম-তারিখ ও মৃত্যু-দিবস নিয়ে মতান্তর রয়েছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে বাংলা ১১৮১ ও ইংরাজী ১৭৭৪ এবং অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন সাহেবের মতে বাংলা ১১৮২ ও ইংরাজী ১৭৭৫ সালে লালন জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বাংলা ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক ও ইংরাজী ১৮৯০-এর ১৮ই অক্টোবর লালন ফকিরের লোকান্তর ঘটে। মনসুরউদ্দিনের লেখায় দেখা যায় ফকির দেহত্যাগ করেছেন বাংলা ১২৯৯ সালে এবং ইংরাজী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। তবে তিনি যে ১১৬ বছর বেঁচেছিলেন, এ বিষয় দুই গবেষকই একমত।

জন্মেছিলেন কোথায় লালন ফকির? এ প্রশ্নেও মতভেদ আছে। তবে উপেন্দ্রনাথ ও মনসুর উদ্দিন উভয়েই বলেছেন, লালন

শাহের জন্ম হয়েছিল কুষ্টিয়ার কুমারখালি থানার ভাড়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে। লালন যে হিন্দু সন্তান, তা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই কিন্তু তাঁর পদবী নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। উপেন্দ্র নাথের মতে লালনের পদবী ছিল কর আর মনসুরউদ্দিন বলেছেন, তিনি ছিলেন রায় বংশের সন্তান।

এ সব বড় কথা নয়। সমস্ত মতানৈক্যেরই মীমাংসা হবে পরবর্তী গবেষণায়, যেমন পরে জানা গেছে, লালন শাহ জন্মেছিলেন, কুমারখালির ভাড়রা গ্রামে নয়, যশোহর জেলার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে।

যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর আরো প্রায় ছাব্বিশ বছর বেঁচেছিলেন লালন ফকির। অন্তত সেই ছাব্বিশ বছরের যথার্থ লালন বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হলে অনেক সত্যই উদ্ঘাটিত হবে। সে কাজ পূর্ণ উদ্যমেই চলেছে এবং গত কয়েক বছরে লালন ফকির সম্বন্ধে সত্যি সত্যি অনেক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহও করা হয়েছে।

লালন শাহ হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও তাঁর সম্বন্ধে প্রচারিত নানা কাহিনী থেকে এবং তাঁর নিজের রচিত গানের কলি থেকেই সমস্ত মতানৈক্যের মীমাংসায় আসা যায়।

হিন্দু পিতামাতার সন্তান ছিলেন লালন, সে বিষয় কোনো বিতর্ক নেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে লালন ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির, সাংসারিক কাজকর্মে তাঁর আকর্ষণ ছিল না—আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান করতেন, স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পন করে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। সংসারের দিকে তাঁর মনকে টানবার জন্য তাঁর দু' ভাই তাঁকে বিয়ে দিলেন এক সুন্দরী হিন্দু বালার সঙ্গে। কিন্তু কিছুকাল পরেই এক অঘটন ঘটে বসল।

কুষ্টিয়ায় এসেছিলেন লালন কিছু কেনাকাটার ব্যাপারে। ফেরার পথে কালীগঙ্গা নদীর ধারে দুরন্ত বসন্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখনকার দিনের বিখ্যাত ফকির সিরাজ সাঁই ও তাঁর স্ত্রীর চোখে পড়লে তাঁরা অর্ধমৃত অবস্থায় লালনকে তাঁদের গৃহে নিয়ে আসেন এবং অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। তবু একটি চোখ তাঁকে হারাতে হয় এবং বসন্তে তাঁর চেহারারও বিকৃতি ঘটে। সম্পূর্ণ সুস্থ ও মজবুত হয়ে উঠলে সিরাজ সাঁই লালনকে তাঁর নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁকে চিনতে না পারায় তাঁর দু'ভাই, ভ্রাতৃবধূদ্বয় এবং এমন কি তাঁর স্ত্রীও তাঁকে লালন বলে মেনে নিতে পারেন নি। অগত্যা তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা সিরাজ সাঁইয়ের বাড়ীতেই ফিরে যান এবং পরে তাঁর কাছেই ফকিরী ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কাজেই লালন যে মুসলমান হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তা'হলেও লালন ফকিরের কাছে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে কোনো পার্থক্যবোধ ছিল না। সব মানুষই এক স্রষ্টার সন্তান, এ ছিল তাঁর কাছে পরম সত্য এবং এ সত্যে যারাই অবিশ্বাসী, তাদের সকলকেই তিনি বিধর্মী বলে মনে করতেন। তাঁর রচিত লোকগাথায় অতি চমৎকার ভাবে এ সত্য ব্যক্ত হয়েছে। একখানি গানে তিনি বলছেন—

'সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবান (যবন)
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান
একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায়না কারো ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান?
বেদ পুরাণে করছে জারি

যবনের সাই হিন্দুর হরি
আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ ?'

লালনের এই কয়টি কথা থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এবং পরে পালক পিতার ধর্ম মেনে নিয়ে মুসলমান হলেও উদার-হৃদয় এই মহান ফকির ছিলেন সমস্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির অনেক উর্ধ্বে মুল মানব ধর্মে বিশ্বাসী। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে তাই সমস্ত বাঙালীই তাঁর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল।

যিনি আল্লাহকে 'অধর কালা' এবং মহম্মদ ও চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে মনে করতেন, তাঁর মতে ঐ দুই মহাপুরুষ তাপিত মানুষের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল।

ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহারা লালন শাহ আশৈশব সঙ্গীত-রসিক। যেখান থেকেই গানের আসরের খবর পাওয়া যেত সেখানেই লালন গিয়ে হাজির হতেন। এতই তিনি গান-পাগলা ছিলেন যে আহার-নিদ্রা ভুলে গ্রামে গ্রামে গায়কদের পিছনে পিছনে ঘুরেও তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করতেন না। তাঁর এই সঙ্গীত-প্রীতিই পাগলা কানাইয়ের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কারণ।

গুরু সিরাজ সাঁই কুষ্টিয়া শহরের অনতিদূরে দেউড়িয়া গ্রামে এক আখরা বসিয়ে সে আখরার ভার দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য লালনের ওপর। লালনের সাধক জীবন শুরু হয় তখন থেকেই। শান্ত প্রকৃতির কোলে বসে পরম পিতার লীলা কীর্তনে ও মানব ধর্মের বন্দনায় গানের পর গান রচনা করে চলতে থাকেন তিনি। সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য ও করুণা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন।

লালন শাহ মূলতঃ ছিলেন বাউল। স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণই বাউলদের বিশেষত্ব। লালনের সঙ্গীতে তাই আত্ম-সমর্পণের ভাবটিই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। আধ্যাত্মিকতা ও আত্মতত্ত্ব তাঁর গানের মূল বিষয় হলেও লালনগীতিতে একঘেয়েমি নেই। সাবলীল ও সুন্দর ভাষায় মানুষের গুণও কত গেয়েছেন তিনি। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন লালন। স্রষ্টার গুণ কীর্তন করতে করতেই তিনি বলেছেন—

'এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
অনন্ত রূপ ছিষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।'

এইতো লালনের মনের কথা। আর এক শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তান কবি চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', এই মহাবাণীই লালন ফকিরের সঙ্গীতে বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সেই মানবতাবাদের সুবিস্তৃত প্রমাণ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের গানে গানে।

বয়সের অনেক তফাৎ সত্ত্বেও মনের বা মানসিকতার দিক থেকে লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ খুব কাছাকাছি ছিলেন। দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও জন্মেছিল যথেষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে লালন ফকিরের নানা আধ্যাত্মিক গান শুনতেন। কবিগুরুর অনেক ভাব-সঙ্গীতে লোককবি লালনের প্রভাব তাইতো আমরা এতটা লক্ষ্য করে থাকি। গীতাঞ্জলী থেকে গীতিমাল্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নানা সঙ্গীতেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। গীতাঞ্জলীর গানের ভাব লালনের বাউল গানেরই ভাবের মতো। তবু দু'জনের গানের জাত আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের মতো লালনও উপনিষদের বাণীকে রূপ দিয়েছেন তাঁর বহু গানে। নিজেকে জানলেই ঈশ্বরকে বা আল্লাহকে পাওয়া যায়, সেই বিশ্বাস থেকেই তো লালন লিখেছেন—

'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন
খবর পাবি কোথায়
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধাঁয়।'

আমি কে, তার সন্ধানই হলো আসল সাধনা। তা জানতে পারলেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ ঘটে। 'আমি' যে আমি শুধু নয় তা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই লালন গান ধরলেন—

'আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয়
আমি শব্দ অর্থ ভারী আমি তো আর আমি নয়।'

তাই বুদ্ধিনাশা হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি না করে মানুষ যাতে নিজের মধ্যেই তার স্রষ্টাকে সন্ধান করে সেজন্য তিনি গাইলেন—

'বল কারে খুঁজিস ক্ষেপা দেশে বিদেশে
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে।'

লালনের আরো কয়েকটি গানে এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

'হাতের কাছে যারে পাও ঢাকা দিল্লী খুঁজতে
যাও কোন অনুসারে।
এমন কি তুই বুদ্ধিনাশা হলি মন সংসারে
ঘরের মধ্যে ঘরখানা, খোঁজ নিয়ো সেইখানে
কে বিরাজ করে।'

২

এমনি ভাষাতেই আত্মার বন্দনা গেয়েছেন লালন এবং আত্মা থেকে দেহ যে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। তাঁরই কথা—

'আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখ্ না রে মন চেয়ে
দেশ বিদেশে দৌড়ে এবার
মরিস বেশ হাঁপিয়ে।'

এমনি সহজ সরল ভাষায় আপন দেহের ঘরেই মনের মানুষের সন্ধান করেছেন লালন। সেই সব গান গেয়ে গেয়ে-গাঁয়ের চাষী, সাধারণ মানুষ দিন কাটিয়েছে। এভাবে কি হিন্দু কি মুসলমান সবাইর কাছেই আপনার জন হয়ে উঠেছেন লালন।

রবীন্দ্রনাথ যখন গান রচনা করলেন—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর' তখন তো লালনের ভাবেরই এক নতুন সুর-ঝঙ্কার শুনতে পেলাম আমরা।

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অন্ত ছিল না লালন ফকিরের। তাই আল্লাহর বিন্দুমাত্র উপেক্ষায় তিনি অভিমানে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু যেমনি তিনি বুঝতে পারতেন তাঁর ভুল ধারণা আল্লাহর কষ্টের কারণ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন স্রষ্টার কাছে। বলেছেন—

'গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার
নেওগো সুপথে
তোমার দয়া বিনে চরণ
সাধব কি মতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনায়ও প্রায় এমনি ভাবই প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তিনি গেয়েছেন—

'আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধুলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।'

লালন ছিলেন হৃদয় জগতের কবি, বাইরের জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে তিনি কখনও চাননি। স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ভাবে ডুবে থাকতেই তিনি ভালোবাসতেন এবং তাই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবন-দর্শন যা ইসলামী দর্শনের মুল কথা, হিন্দু দর্শনেবও। তাই দেখা যায় আল্লাহকে জানবার, তাঁকে পাবার বাসনা নিয়ে লালন যেমন অসংখ্য গান রচনা করেছেন তেমনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানেরও তাঁর লেখাজোখা নেই—দিল খুলে তিনি অনায়াসেই গান ধরেছেন, 'আমায় চরণ ছাড়া কর'না হে দয়াল হরি'।

এমনি উদার মানোভাবের অধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব, নিজেকে যিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবোধের উর্ধ্বে রেখে ঈশ্বরের জয়গান ও মানবতাবাদের প্রচারে আনন্দ লাভ করেন। সে মানুষই বলতে পারেন—

'ভক্তির ডোরে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবনি বলে জাতির বিচার নাই।'

এমন মানুষ কি কখনো বেদ-কোরাণের পার্থক্যের ধার ধারতে পারেন? সুফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত বাউল কবি লালন তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার রচিত লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে একাকার হয়ে আছেন। যতদিন বাঙালীর অস্তিত্ব আছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আছে, লালন ফকিরও ততদিন আছেন। তিনি অমর। তিনি বাঙালীর সামনে এক চিরজীবন্ত জ্বলন্ত আদর্শ।

এমনি ভাষাতেই আত্মার বন্দনা গেয়েছেন লালন এবং আত্মা থেকে দেহ যে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। তাঁরই কথা—

'আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখ্ না রে মন চেয়ে
দেশ বিদেশে দৌড়ে এবার
মরিস বেশ হাঁপিয়ে।'

এমনি সহজ সরল ভাষায় আপন দেহের ঘরেই মনের মানুষের সন্ধান করেছেন লালন। সেই সব গান গেয়ে গেয়ে-গাঁয়ের চাষী, সাধারণ মানুষ দিন কাটিয়েছে। এভাবে কি হিন্দু কি মুসলমান সবাইর কাছেই আপনার জন হয়ে উঠেছেন লালন।

রবীন্দ্রনাথ যখন গান রচনা করলেন—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর' তখন তো লালনের ভাবেরই এক নতুন সুর-ঝঙ্কার শুনতে পেলাম আমরা।

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অন্ত ছিল না লালন ফকিরের। তাই আল্লাহর বিন্দুমাত্র উপেক্ষায় তিনি অভিমানে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু যেমনি তিনি বুঝতে পারতেন তাঁর ভুল ধারণা আল্লাহর কষ্টের কারণ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন স্রষ্টার কাছে। বলেছেন—

'গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার
নেওগো সুপথে
তোমার দয়া বিনে চরণ
সাধব কি মতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনায়ও প্রায় এমনি ভাবই প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তিনি গেয়েছেন—

'আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।'

লালন ছিলেন হৃদয় জগতের কবি, বাইরের জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে তিনি কখনও চাননি। স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ভাবে ডুবে থাকতেই তিনি ভালোবাসতেন এবং তাই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবন-দর্শন যা ইসলামী দর্শনের মূল কথা, হিন্দু দর্শনেরও। তাই দেখা যায় আল্লাহকে জানবার, তাঁকে পাবার বাসনা নিয়ে লালন যেমন অসংখ্য গান রচনা করেছেন তেমনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানেরও তাঁর লেখাজোখা নেই—দিল খুলে তিনি অনায়াসেই গান ধরেছেন, 'আমায় চরণ ছাড়া কর'না হে দয়াল হরি'।

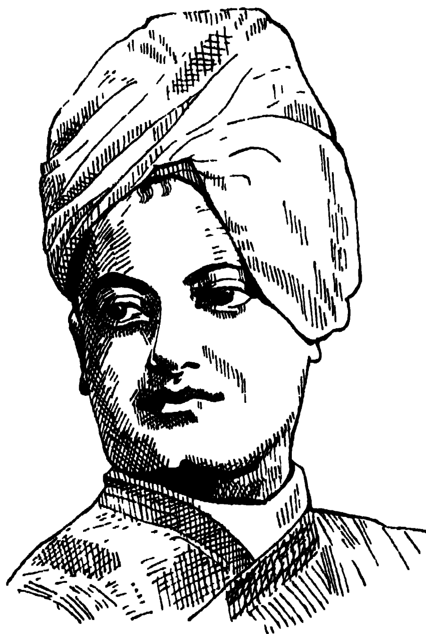
এমনি উদার মানোভাবের অধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব, নিজেকে যিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবোধের উর্ধ্বে রেখে ঈশ্বরের জয়গান ও মানবতাবাদের প্রচারে আনন্দ লাভ করেন। সে মানুষই বলতে পারেন—

'ভক্তির ডোরে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবনি বলে জাতির বিচার নাই।'

এমন মানুষ কি কখনো বেদ-কোরাণের পার্থক্যের ধার ধারতে পারেন? সুফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত বাউল কবি লালন তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার রচিত লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে একাকার হয়ে আছেন। যতদিন বাঙালীর অস্তিত্ব আছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আছে, লালন ফকিরও ততদিন আছেন। তিনি অমর। তিনি বাঙালীর সামনে এক চিরজীবন্ত জ্বলন্ত আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ

কর্ম্মবীর সন্ন্যাসী



হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকিলের বাড়ী। তাই বাড়ীতে সর্বক্ষণ নানাজাতির লোক মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে ভিড় করে থাকে। হিন্দু-মুসলমান—সকল জাতির মক্কেলই বৈঠকখানায় প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন।

একদিন এক অহিন্দু মক্কেল আদর করে উকিলের ছেলেকে কয়েকটি সন্দেশ দিয়ে গেলেন। মক্কেলটি চলে যাওয়ার পর ছেলেটি সেই সন্দেশ খেল। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বাড়ীতে জানাজানি হয়ে

গেল যে, ছেলে এক অহিন্দুর দেওয়া সন্দেশ খেয়েছে, তখন বাড়ীময় একটা হুলুস্থূল পড়ে গেল। ছেলেটির উপর চারিদিক থেকে গালিগালাজ বর্ষিত হতে লাগলো। সকলেই একবাক্যে বলতে লাগলো, 'ছেলেটির জাত গিয়েছে!' বাড়ীর লোকেরা ছিলেন এমনি গোঁড়া!

ছেলেটি আশ্চর্য হলো; তার মনে দুঃখ হলো এই ভেবে যে, সমাজে এইরকম বৈষম্য কেন? কেন আমরা বিশেষ বিশেষ জাতির স্পর্শ এড়িয়ে চলি? অন্য জাতির বলে মক্কেলটির স্নেহের দান, আদরের দান গ্রহণ করায় কি এমন অন্যায় আমার হয়েছে? শুধু তার হাতের ছোঁয়া খাবার খেয়ে আমার জাত যাবে কেন?—এমনিতর বহু প্রশ্ন তার মনে জাগতে লাগলো।

যাই হোক, সেদিন সে শুনলো যে, সমাজে এমন অনেক জাত ও শ্রেণী আছে যাদের ছোঁয়া খেলে জাত যায়। কথাটায় তার মন সায় দিল না বটে, কিন্তু জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা বলে একটা কুপ্রথা যে হিন্দুসমাজে আছে, তা সে উপলব্ধি করলো।

এর পর আর একদিন আবার এমন একটা ঘটনা এই ছেলেটির জীবনে ঘটে গেল, যা থেকে এই ছেলের ভাবী জীবনের কর্তব্য স্থির হয়ে গিয়েছিল।

যেদিন থেকে সে শুনেছিল যে, সমাজের কোন কোন জাতির ছোঁওয়া লাগলে অথবা ছোঁওয়া খেলে জাত যায়, সেইদিন থেকে এই ছেলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল—'দেখব এই জাতিভেদ কতখানি সত্য!'

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরের কথা। একদিন সে তার বাবার বৈঠকখানায় ঢুকে একটা হুঁকো নিয়ে প্রাণপণে টানছিল। হুঁকোটা সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে বাবা ভারী গলায় ডাকলেন—"কি রে বিলে! কি করছিস?"

বালক উত্তর দিল, "যদি জাতিভেদ না মানি তবে আমার কি হবে, তাই পরীক্ষা করছিলাম। কিন্তু কৈ এ হুঁকা খেয়ে আমার জাত তো গেল না।"

ছেলের এই আচরণে বাবা বিস্মিত হয়ে ভাবলেন যে, এত অল্প বয়সে ছেলেটির মধ্যে এমন বিচারবুদ্ধি জন্মালো কি করে ?

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা প্রথা যে অর্থহীন একথা এই বালক তার কিশোর বয়সেই বুঝেছিল। তাই পরিণত বয়সে ইনি মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের আত্মার আত্মীয় বলে ঘোষণা করতে কোনরকম সঙ্কোচ বোধ করেন নি।

এই ছেলেটিরই নাম নরেন্দ্রনাথ। কলকাতার সিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্তবংশে এঁর জন্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন।

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার পাপের মূলে যে সকল মনীষী কুঠারাঘাত করে গিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। সমাজে জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা প্রথা অনুসৃত হয়ে আসছিল বলেই যে একে একটি মঙ্গলকর প্রথা বলে মেনে নেওয়া প্রয়োজন—এ কথায় স্বামী বিবেকানন্দের মন সায় দেয় নি। শাস্ত্রের বিধান, প্রচলিত সামাজিক প্রথা ইত্যাদি তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। সে সবের সত্যতা কিশোর বয়স থেকেই যাচাই করবার জন্য আগ্রহ তাঁর জন্মেছিল এবং যে পর্যন্ত তাঁর সন্দেহ দূর না হতো সে পর্যন্ত বিশ্রাম থাকতো না। ছেলেবেলা থেকে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এমনি একটা বিচারশক্তি, এমনি একটা একগুঁয়ে ভাব ছিল বলেই তিনি পরবর্তী কালে অত মহান হতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের কাজে প্রকাশ পেত একটা দুর্জয় সাহস এবং বলিষ্ঠ কল্পনা।

তখন তাঁর বয়স আট। সখ হলো নৌকো করে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে হবে। সুতরাং কয়েকজন বন্ধু নিয়ে নৌকোয় চড়ে

তিনি মহানন্দে 'গার্ডেন' দেখতে গেলেন। ফিরবার সময় বাধলো ভীষণ গোলমাল। নৌকোয় কে কি করেছিল,—তাই নিয়ে মাঝিদের সঙ্গে প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে মাঝিদের রাগ সপ্তমে চড়লো। মাঝিরা বললো যে, তারা নৌকো ডাঙ্গায় ভিড়াবে না, ছেলেদেরকে জব্দ করবে। ছেলেরা তো হতভম্ব! কিন্তু যেই নৌকোটা তীরের খানিকটা কাছে গেছে আর অমনি নরেন্দ্রনাথ ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়ে ছুটলেন। কিছুদূর দিয়ে দুইজন গোরা সৈন্য যাচ্ছিল। নরেন্দ্রনাথ সোজা তাদের কাছে গিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে নিজেদের বিপদের কথা জানালেন। এইটুকু ছেলের এমন সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখে তারা অবাক হলো। বালক নরেন্দ্র তাদের রাস্তা দেখিয়ে ঘটনাস্থলে আনলেন। তারা বালকদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলো।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের সাহসিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও নেতৃত্ব এই রকম শতসহস্র ঘটনার মধ্যে আপনা আপনিই হয়ে উঠেছিল। এই স্বভাবজাত বৃত্তির সাহায্যেই নরেন্দ্রনাথ পরে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

বর্তমান যুগে যে সব বাঙালী নিজেদের জীবনের সাধনা দিয়ে জাতিকে জগতের সম্মুখে মর্যাদা দান করেছেন, জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছেন—তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বীরসিংহের প্রচণ্ড বিক্রমে, বাগ্মিতায় ও জ্ঞানগরিমায়, স্বদেশভক্তি ও বিশ্বপ্রেমে সমগ্র পৃথিবী শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়েছিল। সামান্যমাত্র গৈরিক বসনে পৃথিবী জয় করে আসা একমাত্র এই অসীম প্রতিভাশালী হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেই চোখে পড়ে এমন কতকগুলি লোককে, যাঁরা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিয়েছেন, বদলে দিয়েছেন,

যাঁদের স্বভাব, কাজ, চলাফেরা প্রভৃতি সাধারণ লোক থেকে যেন একটু আলাদা। আমাদের মতই তাঁরা হাসেন, খান, ঘুমান। কিন্তু আমরা যে জিনিসটা সাধারণভাবে দেখি, সেই জিনিসটার মধ্যেই হয়ত তাঁরা এমন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁদের নিজেদের সমগ্র জীবনধারা পাল্টে, বদলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনেও সহায়তা করে।

কিন্তু সেই জিনিসটা কি, যার এত ক্ষমতা, যা মানব-সমাজে একটা ওলটপালট এনে দেয়, যা প্রচলিত বাধা-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করে দুনিয়াতে নূতন সমাজের পত্তন করে? কোন মহান্ আদর্শের অনুপ্রেরণা শক্তিশালী মহামানবের চিত্তে সঞ্চারিত না হলে এরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। দৃঢ়সঙ্কল্প বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নেপোলিয়নকে দিগ্বিজয়ী করেছিল; কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদনের পুত্রকে কে চিনতো, যদি তিনি মানবের দুঃখ দূর করবার জন্যে রাজ্য-সংসার পরিত্যাগ করে দুঃখজয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ না করতেন? সেইজন্যই একটা প্রবাদ আছে,—বোমা-বারুদের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ফোরণের ক্ষমতা রয়েছে এক একটি ভাবধারার মধ্যে! নইলে, একজন সামান্য বাঙালীর ছেলে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯৬ সালে শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় দাঁড়িয়ে সমবেত পাশ্চাত্য ধর্মের খ্যাতনামা প্রতিনিধিগণের সম্মুখে কেমন করে নিজের বাগ্মিতায় সমস্ত পৃথিবীর মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ভারতধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন? সেদিন যদি বিবেকানন্দ ব্যর্থ হতেন—বিপদে ও সঙ্কোচে নুয়ে পড়তেন, তবে আজ পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা এতখানি মর্যাদা পেত না। স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম জগৎকে শিখিয়েছিলেন ভারত উপমহাদেশকে শ্রদ্ধা করতে, ভারতের মহিমা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে।

বাল্যকাল হতেই বিবেকানন্দ দেশের দুঃখ-দুর্দশায় অস্থির হয়ে

পড়তেন; তাঁর মনে ধর্মভাবও অত্যন্ত প্রবল ছিল। পরবর্তী কালে এই ধর্মভাবের সঙ্গে তাঁর স্বদেশানুরাগ মিশে গিয়ে তাঁর অন্তরে এক নবভাবের বিকাশ ঘটিয়েছিল। এই নবভাবই হলো তাঁর দরিদ্র-নারায়ণের সেবাব্রত।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি বর্তমান যুগের হিন্দুধর্মকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। আবার কেউ তাঁকে দার্শনিক পণ্ডিতরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন। অনেকে তাঁকে একজন বিশ্বপ্রেমিক হিসেবেই গণ্য করতে পারেন। কিন্তু আমরা বলবো,—তিনি ছিলেন নতুন যুগের জাগরণ মন্ত্রের ঋষি। ভারত উপমহাদেশে যে গণজাগরণ দেখা দিয়েছে, তার মূলে তাঁর বাণী নিঃশব্দে প্রাণসঞ্চার করছে বহু বছর ধরে।

সকলেই মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের কথা জানেন। কিন্তু ক'জন একথা জানেন যে, অর্দ্ধ শতাব্দীরও আগে এই বীর সন্ন্যাসীই স্বদেশের পদদলিত মূক মানব-সন্তানকে ডেকে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন; বলেছিলেন, "তোমরা সকলে অমৃতের সন্তান, তোমরা দরিদ্র-নারায়ণ।" বিবেকানন্দই প্রথমে তাঁর স্বদেশবাসীদের দরিদ্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে বলেছিলেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৮৮৬ সালে গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। কোথাও তিনি শান্তি দেখতে পেলেন না। শুধু দেখতে পেলেন, মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক আর সন্তাপ। তাঁর হৃদয় সমবেদনায় উথলে উঠলো। একদিন ভারতের শেষপ্রান্তে সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ নিশ্চল হয়ে বসে আছেন—অকস্মাৎ তাঁর চোখের সামনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভারত প্রকাশিত হলো,—"এই আমার ভারতবর্ষ, এই আমার মাতৃভূমি,—দুর্ভিক্ষ-মহামারী-দুঃখ-রোগ-শোক-ব্যথা-

জর্জ্জরিত, ছিন্নবসন-পরিহিত, যুগ-যুগান্তের নিরাশা-ক্লিষ্ট নর-নারী, বালক-বালিকাগণ অন্নাভাবে প্রপীড়িত, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের অভাবে ভারত কঙ্কালে পরিপ্লুত, মহাশ্মশানে পরিণত!" বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে ঝর ঝর অশ্রুধারা বইলো। মনে হলো, "এদের ফেলে আমি কোথায় ঈশ্বর খুঁজি? এরাই তো জীবন্ত ঈশ্বর।" গৌতম বুদ্ধের মত উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির জন্য বিবেকানন্দ স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

পৃথিবীর যেখানেই তিনি গিয়েছেন, অন্য জাতির অবস্থার সঙ্গে ভারতবাসীর অবস্থা তুলনা করে তাঁর প্রাণ সব সময়েই ছটফট করতো। শয়নে-জাগরণে তাঁর শুধু এক স্বপ্ন ছিল,—কি করে এই অধঃপতিত জাতিকে উন্নত করা যায়, সকল জাতির সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। জাপানীদের উন্নতি দেখে কোন বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন, —"নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে এসে দেখ, সব জাতি কেমন চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তা' হলে এসো, ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে যেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, জন্তু নয়।"

বিজয়ীর বেশে দেশে দেশে ফিরে বিবেকানন্দ আমাদের অধঃপাতের কারণ নির্ণয় করলেন। এদের মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা প্রধান। শরীর দুর্বল হলে মস্তিষ্কও দুর্বল হয়; সকল কাজে অবসাদ আসে ও প্রতি পদে নিজের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়। কাজেই তিনি দেশের যুবকদের শারীরিক শক্তি অর্জনে ও ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারব্রতে তিনি সকলকেই উৎসাহিত করতে লাগলেন। যুবকদের ডেকে বললেন,—"দুর্ভিক্ষ হয়েছে, চলে যা সেই দিকে, না হয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে, মরছে; তা'তে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরাই ভাল। তোরাই তো

দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে বড় কষ্ট হয়। লেগে যা !—দেরী করিস না—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি বলে আর বসে থাকিসনি, তা হলে কিছুই হবে না !"

এই স্বদেশভক্ত বীর-সন্ন্যাসীর প্রতি রক্তকণায় স্বদেশের প্রতি গভীর মমতার স্রোত প্রবাহিত হতো। একদিন কোন দেশনেতার সঙ্গে আলাপে তিনি বলে উঠলেন,—"যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর অভুক্ত থাকবে ততদিন তাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা' কিছু সব অধর্ম !"

বিবেকানন্দ রাজনীতিক ছিলেন না, তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ রাজনীতির অনেক উর্দ্ধে, দেশকেও তিনি সেই উচ্চতর লক্ষ্যে, উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে প্রয়াস করে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিতে যোগ দেননি। কিন্তু এটা সকলেই জানেন, তিনি যে সেবাধর্ম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই বর্তমান জাতীয় গণ-জাগরণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেইজন্যে স্বামীজী এমন একদল নরনারী তৈরী করতে চেয়েছিলেন, "যাহারা গতানুগতিক ভাবে স্বার্থান্ধ হইয়া ভোগ-লালসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না—যাহারা নরনারায়ণের সেবায় সর্বস্ব অর্পণ করিয়া যুগ-পরিবর্তনের সহায়ক হইবে, অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবে,—অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে।"

এই হলো বিবেকানন্দের নবযুগের সন্ন্যাস ধর্ম। একে আশ্রয় করে কত লোক পরহিতের জন্য ঘর ছেড়েছেন, কত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন, আবার কতজন আদর্শের জন্য জীবনপাত করেছেন। বিশ্বকল্যাণব্রতী সন্ন্যাসীর কাছে সব পতিত মানবে ঈশ্বরের সত্তা অনুভূত। তিনি দিব্যচক্ষে দেখলেন, ভারতের অধঃপতনের মূলে অসাম্য—বিশেষ করে সামাজিক অসাম্য। তাই তিনি জাতিকে বাঁচাবার সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—"আমার দিব্যচক্ষে দেখছি এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি

রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোন কালে উঠেছে দেখেছিস ?"

এই অধঃপতনেও সন্ন্যাসী বিচলিত হননি। সকলকে আশার বাণী শুনিয়ে তিনি বললেন,—"এবার কেন্দ্র—ভারতবর্ষ। কিন্তু কি করে মৃত্যুর হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব ? প্রত্যেক মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দিলে তো কোন দেশ বাঁচতে পারে না।" তাই তিনি ভারতবাসীকে জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে বললেন—"হে মানব, মৃত্যুর পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি।...দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ও ভেদাভেদ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনে সহায়তা কর।"

এই যুগসন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান কি ব্যর্থ হবে ?

স্যার আশুতোষ

শিক্ষাব্রতী পুরুষসিংহ



একদিন সহসা কলকাতা শহরে একটা দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে গেল, আর সংবাদটা অল্প সময়ের মধ্যেই মুখে মুখে চারদিকে রটে গেল। কেউ কোনদিন যা ভাবতে পারেনি, তাই সম্ভব হলো। জুড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে একদিন এক ব্যক্তি খাঁটি বাঙালীর পোশাক প'রে ময়দানের নিকটস্থ 'রেড রোডে'র ফটকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গোরা পাহারাওয়ালা বাধা দিল। বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর রোষনেত্র তুলে বললেন, "জানিস্, আমি কে? স্যার আশুতোষ মুখার্জি, কলকাতা হাইকোর্টের জজ।" পাহারাওয়ালা সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিল। আশুতোষ কিন্তু সেইখানেই নিরস্ত হলেন না। তিনি বাড়ী ফিরেই সোজা বাঙলার গভর্ণর লর্ড

কারমাইকেলকে ফোন করলেন,—"আমি স্যার আশুতোষ মুখার্জি, কলকাতা হাইকোর্টের জজ, আপনাকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করছি, —কলকাতার 'রেড রোডে'র উপর দিয়ে এ দেশের লোকদের চলাচল নিষিদ্ধ কি?" গভর্ণর উত্তর দিলেন—You may go. You শব্দের অর্থ এখানে তুমি না তোমরা? তাই আশুতোষ লাটসাহেবকে আবার প্রশ্ন করলেন,—"আপনি কেবলমাত্র আমার কথা বলছেন, না, 'রেড রোড' দিয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর যাতায়াতের অধিকারের কথা বলছেন? আমি কোন ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আপনাকে ফোন করিনি, আমার সকল দেশবাসীর জন্যই আপনার মতামত জিজ্ঞাসা করছি।" লর্ড কারমাইকেল বুঝলেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই। লাটসাহেবের হুকুমে সেই দিনই 'রেড রোড' সমান ভাবে দেশীয়-বিদেশীয় সকলের জন্য খুলে দেওয়া হলো। ইতিপুর্বে এই রাস্তায় কালা আদমী বলে কোন বাঙালী বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীর গাড়ী হাঁকিয়ে যাবার অধিকার ছিল না। কেবল মাত্র 'বেড' অর্থাৎ ইউরোপীয়রা অবাধে এই পথে গাড়ী চালিয়ে যেতে পারতো বলেই পথটি 'রেড রোড' নামে পরিচিত হয়। আশুতোষের হস্তক্ষেপের ফলেই এই অপমানকর ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়।

এমনই ছিল পুরুষসিংহ আশুতোষের চরিত্রের দৃঢ়তা। দেশের ও জাতির অপমানকে নিজের অপমান বলে মনে করা, দেশবাসীর মর্যাদাকে নিজের মর্যাদা বলে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর একটা বিশেষত্ব।

আশুতোষের জীবনে এরূপ দুর্জয় সাহসিকতা ও দেশাত্মবোধের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাঙলার গভর্ণমেণ্ট যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করে ওকে একটি সরকারী যন্ত্রে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই সময় তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড লীটনের কাছে স্যার আশুতোষ যে সমস্ত তেজস্বিতাপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন, তা

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর ১৯২২ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে তিনি এক অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় বাঙলার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন,—"তোমরা এক হাতে দিতে চাও অর্থ, অপর হাতে দাসত্ব। এরূপ দান আমরা ঘৃণার প্রত্যাখ্যান করি। আমরা ব্যয় কমিয়ে আয়ের মধ্যে থাকার চেষ্টা করব। আমরা উপবাসী থাকব, সারা বাঙলার দুয়ারে দুয়ারে ফিরে ভিক্ষা করব, তবু এ টাকা আমবা চাই না।" এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বললেন,—"স্বাধীনতাই আমার প্রথম কথা, স্বাধীনতাই আমার দ্বিতীয় কথা এবং স্বাধীনতাই আমার শেষ কথা।"

এইজন্যই আশুতোষকে বলা হয় 'বাঙলার ব্যাঘ্র'। সত্য সত্যই ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি একদিন বলেছিলেন,—"ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করলে বাঙলার এই শার্দুল ফরাসী-ব্যাঘ্র ক্লেমেঁসু' অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করতেন। সমগ্র ইউবোপেব কোথাও তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি নেই।" এই পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী কার না জানতে ইচ্ছা হয়?

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁব পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায একজন খ্যাতনামা ডাক্তাব ছিলেন। বাড়ীতে কিছুদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করে আশুতোষ ১৮৭৪ সালে দশ বৎসর বয়সে 'সাউথ সুবারবন স্কুলে' ভর্তি হন। এই সময় থেকেই আশুতোষকে গণিতশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত দেখা যায়। স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই তিনি এফ. এ. পরীক্ষার পাঠ্য গণিতের বিষয়গুলি প্রায় শেষ করেছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজের ছাত্র হলেও তিনি সর্বপ্রকার বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করলেন। এফ. এ. পরীক্ষার সময় তিনি

খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮০ সালে কেম্ব্রিজের এক গণিত বিষয়ক পত্রিকায় আশুতোষের কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং ঐ প্রবন্ধগুলিতে যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তা বাঙলাকে জগৎ-সমক্ষে বিশেষ মর্যাদা দান করে। তারই ফলে আশুতোষ .বিলাতের এফ, আর, এ, এস, এবং এফ, আর, এস, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্বে কোন বাঙালীর ভাগ্যে এই সম্মানজনক উপাধি লাভ ঘটেনি।

১৮৮৪ সালে আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পর বছর এম. এ. পরীক্ষায় গণিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে পুররায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। ঐ বছরেই সসম্মানে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। আইন সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৮৯৪ সালে 'ডক্টর অব ল' উপাধি লাভ করেন।

১৮৮৯ সালে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হন এবং ছ'মাস পরেই ২৪ বছর বয়সে সিণ্ডিকেটেরও সভ্য নিযুক্ত হন। এত অল্প বয়সে তাঁর আগে এই পদ আর কেহ ভূষিত করেন নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পদ অধিকার করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইনে'র অধ্যাপক-পদ লাভ করেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০১ সালেও তিনি পুনরায় ঐ পদে নির্বাচিত হন। ১৯০৩ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও লর্ড কার্জনের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন।

১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত আশুতোষ পর পর

চারবার তাঁর জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। ঐ ক'বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আশুতোষ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমান রূপে রূপায়িত করে গিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গগণস্পর্শী দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, এর পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ, প্রাসাদোপম বিজ্ঞান-কলেজ, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন, ছাত্রদের বাসোপযোগী বিরাটকায় হার্ডিঞ্জ হোস্টেল এবং সবার উপরে বাংলা ভাষাকে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবর্তন ও পৃথিবীর নানা দেশীয় ভাষা ও নানা বিদ্যার একত্র সমাবেশ প্রভৃতি আশুতোষকে অমর করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, প্রাচীন কীর্তি উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষিতমণ্ডলীকে বাঙলার এই মুল শিক্ষা-নিকেতনে আহ্বান করেছেন। এমনি করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সত্য সত্যই একটি আন্তর্জ্জাতিক মিলনকেন্দ্রে পরিণত করে গিয়েছেন।

১৮৯১ সালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করলে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও যুবক আশুতোষ দমলেন না; তিনি কঠোরতর দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হলেন। ক্রমে তাঁর চেষ্টায় বাংলাভাষা প্রবেশিকা হতে এম. এ. পর্যন্ত অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হলো। মাতৃভাষাকে পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে যোগ্য স্থান দেওয়াই ছিল বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সাধক আশুতোষের শ্রেষ্ঠতম সাধনার বিষয়। বাংলাভাষায় তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু সাহিত্যিক সৃষ্টির উপায় করে গিয়েছেন। আশুতোষ বাঙালী জাতিকে ভালবাসতেন। বাঙালীর সবকিছুই তাঁর কাছে চির আদরের বস্তু ছিল।

বাল্যকাল থেকেই হাইকোর্টের জজ হওয়া ছিল আশুতোষের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা এবং সত্যি সত্যিই তিনি ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের

বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। ১৯২০ সালে তিনি কিছুকালের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কাজও করেছিলেন। মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারপতি হিসেবে তিনি অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা ও যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

আশুতোষ কর্মী হিসেবে দেশহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং প্রতিটি বিভাগের কাজ ভালভাবে পরিচালনা করতেন। তিনি তিনবার এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। আদর্শ ও কর্মকুশলতার এমন মিলন খুবই বিরল। দ্বারভাঙ্গা ভবনে আশুতোষের মর্মরমূর্তি উন্মোচনের উৎসব-দিনে বাঙলার লাট লর্ড কারমাইকেল বলেছিলেন, "কোন একটা জিনিস সম্বন্ধে বিরাট কল্পনা করবার শক্তি আশুতোষের ছিল, কিন্তু সেই কল্পনা কার্যে পরিণত করবার শক্তি অনেকের নেই, আশুতোষের তাও ছিল।"

আশুতোষ সরলহৃদয় ও অনাড়ম্বর ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে লাট সাহেবের কাছেও তিনি ধুতি-চাদর পরেই যেতেন। বাঙালীর নিজস্ব পোশাক পরে চলাফেরা করতে, বাঙালীর নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে ও বক্তৃতা দিতে তিনি গৌরব বোধ করতেন। মোটের উপর তিনি আমরণ বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন। সামান্য একটিমাত্র ঘটনা হতেই তাঁর স্বাজাতিকতা-বোধের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে একমাত্র তিনিই ঐ কমিশনের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর পোষাকে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। কমিশনের সভ্যগণের সম্মানের জন্য মহীশূর-দরবার একটি ভোজ-সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। আশুতোষ নগ্নমস্তকে নিজস্ব বেশেই ভোজ-সভায় উপস্থিত হলে মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য একটি

উষ্ণীষ পরিধান করতে অনুরোধ করেন। আশুতোষ জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরে বললেন,—"আমি তা পারব না। কোথাও বাঙালীর বেশ পরিত্যাগ করিনি, এখানেও তা করব না।" এই বলে তিনি একেবারে নিজের বাসায় গিয়ে হাজির। ব্যাপার গুরুতর বুঝে মহীশূররাজ ব্যক্তিগত অনুরোধসহ নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে বাঙালী আশুতোষ সগৌরবে ক্ষমার হাসি হাসতে হাসতে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন। এই ঘটনার জন্য মহারাজার কাছে প্রধানমন্ত্রীকে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। আশুতোষের জীবনে এরূপ নির্ভীকতা ও গভীর স্বাদেশিকতার এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা কোন পরাধীন দেশে সচরাচর দেখা বা শোনা যায় না। একবার পূর্বোক্ত স্যাডলার কমিশনের কোন কার্যোপলক্ষে তিনি আলিগড় গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে তিনি ট্রেনের কামরায় আসছিলেন সেই কামরায় একজন ইংবেজ 'মিলিটারী অফিসার' ছিলেন। কিছুদূর আসতেই আশুতোষ তন্দ্রামগ্ন হলেন। এমনি সময়ে সেই ইংরেজ অফিসারটি তাঁর একটি নাগরা জুতো বাইরে ফেলে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ঘুম ভাঙতেই আশুতোষ তাঁর একটি জুতো না দেখে অনায়াসে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন এবং সেই মুহূর্তেই সাহেবের কোটটিও বাইরে ফেলে দিলেন। একটু পরেই সাহেবের ঘুম ভাঙলো। তিনি নিজের কোটটি না দেখে খুব তর্জন গর্জন আরম্ভ করলেন। আশুতোষ গম্ভীবভাবে বললেন,—"তোমার কোট আমার জুতো আনতে গিয়েছে।" সাহেব এই উত্তর শুনে একেবারে চুপ।

আশুতোষ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার বই কিনেছিলেন। এবং এই সব বই ভালভাবেই পড়েছিলেন। তিনি এই বিরাট পুস্তকালয়ের নাম দিয়েছেন 'বাণীমন্দির'। এই 'বাণীমন্দির' বাঙালীর একটি গৌরবের বস্তু। এ ছাড়া তিনি কন্যা কমলা ও

মাতা জগত্তারিণী দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে কিছু টাকা দান করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য কোন উপযুক্ত পুরুষ অথবা নারীকে প্রতি বছর নির্বাচিত করে 'কমলা স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডার' থেকে নির্ধারিত অর্থ দেওয়া হয়। আর 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রতি দুই বছর অন্তর শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখক অথবা লেখিকাকে পুরস্কার রূপে দেওয়া হয়।

আশুতোষ তাঁর মাকে দেবীর মত ভক্তি করতেন। এমনকি, তাঁর কথা ছাড়া এক পা-ও অগ্রসর হতেন না। তিনি তাঁর মাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করতেন নীচের গল্পটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯০২ সালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় সেই সময়কার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কার্জন তাঁকে বিলেত যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তরে আশুতোষ তাঁকে বললেন, তাঁর মায়ের ইচ্ছা নয় যে, তিনি বিলেত যান। লর্ড কার্জন তাঁকে বললেন "তিনি যেন তাঁর মাকে জানান যে, স্বয়ং বড়লাট এবং রাজপ্রতিনিধি তাঁর পুত্রকে যেতে আদেশ করছেন।" প্রত্যুত্তরে আশুতোষ ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তাঁকে বললেন,—"আশুতোষ তাঁর মায়ের কথার বিরুদ্ধে কিছুই করতে রাজী নন, সে আদেশ স্বয়ং রাজপ্রতিনিধিরই হোক অথবা তাঁর চেয়েও বড় আর কারো হোক।"

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হলেও আশুতোষ সঙ্কীর্ণমনা রক্ষণশীল ছিলেন না। যা কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য তিনি নির্ভয়ে তাব প্রতিবাদ করতেন এবং নিজেই এমন কিছু করতেন যার দৃষ্টান্ত অনুসরণে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হতে পারে। বহু বাধা অতিক্রম করে তিনি তাঁর বিধবা কন্যা কমলার বিয়ে দিয়েছিলেন।

আশুতোষ ১৯২১ সালে পঞ্চম বার ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন এবং তাঁর কার্যকাল ছিল ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। তাঁর প্রাণ ছিল ছাত্রগত। কত ছাত্রকে যে কতভাবে তিনি সাহায্য করেছেন তার

ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময়ে আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজ এক ও অভিন্ন হয়ে গড়ে উঠেছিল।

১৯২৪ সালে তিন দিন রোগভোগের পর বাঙলা মায়ের কৃতী সন্তান আশুতোষ পাটনাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ সেই দিনই কলকাতায় আনা হয়। জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ বিরাট শোভাযাত্রা করে মৃত মনীষীর প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সর্বত্যাগী সাধক



সাদা মানুষের দেশ ইংল্যাণ্ড। সেখানে একটি সভা হচ্ছে। সভায় বহু ভারতীয় ছাত্র—কালো মানুষের দেশের ছেলেরা উপস্থিত থেকে সেই সভায় বক্তৃতা শুনছেন। সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেই সাদা মানুষদের দেশেরই একজন লোক—তাঁর নাম জেম্‌স্ ম্যাকলিন। ম্যাকলিন সাহেব পার্লামেন্টের সভ্য। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি ভারতবর্ষের নিন্দা করে বললেন, "ভারতের আবার সভ্যতা কোথায়? ভারতের ইতিহাস তো গোলামীর ইতিহাস!"

কথাটা শুনে উপস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব, একটু আপত্তির ভাব ফুটে উঠলো। কিন্তু কেউই ম্যাকলিন সাহেবের কথার উপযুক্ত জবাব দেবার সাহস পেলেন না।

হঠাৎ দেখা গেল একটি বাঙালী যুবক ম্যাকলিন সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদে একেবারে গর্জন করে উঠলেন। যুবক সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন, ম্যাকলিন সাহেবের কথার প্রতিবাদ করলেন ওজস্বী ভাষায়। জন্মভূমির অপমান যুবকের প্রাণে বড় লেগেছিল, তাই তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করে ম্যাকলিন সাহেবের মন্তব্যের কঠোব উত্তব দিলেন—প্রমাণ করলেন যে, ভারতও সভ্য, ভারতেরও সভ্যতা আছে, সংস্কৃতি আছে। ইংল্যাণ্ড সভ্য হওয়ার বহু পূর্বেই ভারতে সভ্যতার অরুণোদয় হয়েছিল, সভ্যজগতে ভারত অতি প্রাচীন কালেই একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার কবেছিল। সেদিন ঐ বাঙালী যুবক একথাটা শুধু প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হননি, যুবক সেদিন ম্যাকলিন সাহেবকে ক্ষমা চাইতে পর্যন্ত বাধ্য করেছিলেন। তাঁর যুক্তি-তর্কে আর দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে ম্যাকলিন সাহেবকে ভারত সম্বন্ধে তাঁর অপমানকর উক্তি প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

সেই সময়েই এই ভারত হতে—এই কালোর দেশ হতে আর একজন তেজস্বী পুরুষসিংহ ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম দাদাভাই নৌরজী। দাদাভাই নৌরজী ঠিক করলেন, তিনিও পার্লামেণ্টের সভ্য হবেন। একজন ভারতীয় ইংল্যাণ্ডের আইন-সভা পার্লামেণ্টের সভ্য হবেন—এ জিনিসটা অনেক ইংরেজের ঠিক মনঃপূত হলো না। তাই দাদাভাই নৌরজীর বিরুদ্ধে সে দেশে প্রচারকার্য শুরু হলো। একদিন এমনিতর প্রচারকার্য চালাতে গিয়ে লর্ডস স্যালিসব্যারি নামে একজন ইংরেজ তাঁর এক বক্তৃতায় ভারতবাসীদের নিন্দা করে বললেন,—"ভারতীয়েরা দাস মনোভাবাপন্ন জাতি বৈ আর কিছুই নয়। সুতরাং কোন ভারতীয় ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্য হবেন এ অসম্ভব, এ অসহনীয়। ভারতীয়েরা ইংল্যাণ্ডের

মত স্বাধীন দেশের আইন-পরিষদের সভ্য হবার অযোগ্য,…” ইত্যাদি।

স্যালসব্যারির এই কথায় স্বদেশভক্ত তেজস্বী ঐ যে বাঙালী যুবক, যিনি ম্যাকলিন সাহেবের মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দিয়ে ম্যাকলিন সাহেবকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়েছিলেন, তাঁর আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগলো। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অপমানের কথা শুনে তিনি এবারেও আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, “ভারত-মাতার সন্তান আমি। সাহেব ভারতীয়দের লক্ষ্য করে যে অপবাদ বর্ষণ করেছেন, তা যদি আমি মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে না পারলাম তবে আমি ভারতসন্তান কিসে?

তারপর দাদাভাই নৌরজীর পক্ষ সমর্থন করে এই বাঙালী যুবক অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীব্র ভাষায় ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন—ভারতীয়দের সম্বন্ধে লর্ড স্যালিসব্যারী যে অপমানকর কথা বলেছিলেন তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা দিয়ে তিনি ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে লাগলেন।

যুবকের বক্তৃতা শুনে ইংরেজরা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, একজন ভারতীয়,—যাদের আমরা অবজ্ঞা করি, তার মধ্যে এত তেজ! তাঁরা দেখলেন, পরাধীন ভারতবাসীর মনের মধ্যেও স্বাধীন চিন্তাধারা ফল্গুস্রোতের মতই বয়ে চলেছে। ভারতীয়রাও স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম—ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা, স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ—এ সবই ভারতীয়দের মধ্যেও আছে। এই যুবকের যুক্তি-তর্ক শুনে ইংরেজরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে লর্ড স্যালিসব্যারি যা বলেছেন তা মিথ্যা এবং এই যুবকের চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত দাদাভাই নৌরজী ইংল্যাণ্ডের আইন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

এই সেই বাঙালী যুবক—যিনি ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে দেশের সুনাম আর মর্যাদা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ইনিই

চিত্তরঞ্জন দাশ। স্বদেশকে ইনি বড় ভালবাসতেন। তাঁর দেশ-সেবায় মুগ্ধ হয়ে দেশবাসী 'দেশবন্ধু' এই নাম-সম্মানে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙালীর প্রাণে গভীর দেশপ্রীতি এবং আত্মসম্মান জাগিয়ে তুলেছিলেন। আজ আমরা দেশের দিকে চাইতে শিখেছি, দেশের মর্যাদা বুঝেছি। এ সকলেরই মূলে আছে দেশবন্ধুর সাধনা। তাঁরই সোনার কাঠির স্পর্শে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত বাঙলার কোটি কোটি নর-নারীর মনে নব-জাগরণের প্রভাতী-আলোর রেখা ফুটে উঠেছিল।

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম ছিল অকৃত্রিম, তাঁর তেজ ছিল আগুনের মত—যেমনি প্রখর তেমনি ভাস্বর। বাঙলা অথবা বাঙালীকে, কিংবা ভারতবর্ষ অথবা ভারতবাসীকে কেউই তাঁর সামনে নিন্দা করে এড়িয়ে যেতে পারতো না। স্বদেশ অথবা স্বদেশবাসী—কারও নিন্দা শুনলে তিনি তখনই বাঘের মত গর্জে উঠে তার প্রতিবাদ করতেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাশ একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সসম্মানে বি. এ. পাশ করে চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে যান। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছেলেবেলা থেকেই স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি সেখানে ভারত সম্বন্ধে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এতে তিনি কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ-ভাজন হন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করলেন। প্রথমে তাঁর তেমন পসার হয়নি। কিন্তু বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার সময় তিনি দেশের সুসন্তান শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন

করে যেরূপ গভীর আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে চারদিকে তাঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, চিত্তরঞ্জনেরও অর্থ-উপার্জনের পথ প্রশস্ত হলো। শোনা যায় সেই সময় পৃথিবীর মধ্যে যে ক'জন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বেশী টাকা উপার্জন করতেন, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করলে চিত্তরঞ্জন আর স্থির থাকতে পারলেন না। রাজার ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে তিনি পথে এসে দাঁড়ালেন। সেই অবধি তিনি দেশজননীর সেবায় সর্বস্ব উৎসর্গ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে গিয়েছেন।

দেশসেবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। দেশের কল্যাণকর সমস্ত কাজের সংগে তিনি নিবিড় ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি চরমপন্থী ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। দেশের জন্য তাঁকে কয়েকবার কারারুদ্ধও হতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন গয়া কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর অতুলনীয় দেশসেবায় ও ত্যাগে বাঙালী—শুধু বাঙালী কেন সমস্ত ভারতবাসী মুগ্ধ হয়েছিল। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়ররূপে তিনি দরিদ্রনারায়ণ-সেবার যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন তা অতুলনীয়। কলকাতা মহানগরীর উন্নতির জন্য তিনি এত কাজ করে গিয়েছেন যে, তা বলে শেষ করা যায় না।

তাঁর পিতার অনেক ঋণ ছিল। দেউলে বলে ঘোষিত হওয়ায় তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তবুও যা তিনি ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন, তা কাজে পরিণত করতে

কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর দানের তুলনা হয় না। তাঁর দানের উপর বহু পরিবারের জীবন নির্ভর করতো। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁর সাহায্যে লেখাপড়া শিখেছে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি তাঁর কলকাতার বাসভবনটি পর্যন্ত জাতিকে দান করে গিয়েছেন। এইটিই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে।

দেশবন্ধু শুধু স্বদেশপ্রেমিক ও দানশীলই ছিলেন না, তিনি সুসাহিত্যিক এবং কবিও ছিলেন। তাঁর 'সাগরসঙ্গীত' একখানি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। 'নারায়ণ' নামক মাসিক-পত্রের তিনি পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন মঙ্গলবার দার্জিলিঙে বঙ্গজননীর এই শ্রেষ্ঠ সন্তান মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর শব কলকাতায় আনা হয় এবং কেওড়াতলা শ্মশানে সৎকার হয়। সেই শবানুগমনে যত লোকের সমাবেশ হয়েছিল, এদেশে ইতিপূর্বে কোন রাজা, মহারাজা বা দেশনেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তেমন হয়নি, লক্ষ লক্ষ লোক সেই শবযাত্রায় যোগদান করেছিল। মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে দীনহীন কুটীরবাসী পর্যন্ত দেশবন্ধুর শেষ দর্শনের জন্য ব্যাকুল! অনেক ইউরোপীয়ও নগ্নমস্তকে ও নগ্নপদে শবানুগামী হয়ে এই জননেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন।

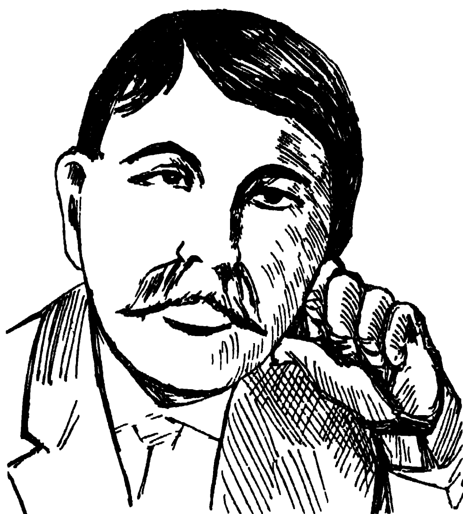
চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে বাঙালীসুলভ কয়েকটি বিশিষ্ট গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর দানশীলতায়, কবিত্বে এবং সঙ্গীতপ্রিয়তায় বাঙালী হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় পাই। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা বাঙালী মনীষার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। সংগ্রামক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর-হৃদয় দুর্দমনীয় বীর। একদিকে তিনি বজ্র অপেক্ষা কঠোর, অন্য দিকে তিনি কুসুম হতেও কোমল। কেবলমাত্র ক্ষণজন্মা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের চরিত্রেই এই সব পরস্পরবিরোধী

গুণের সংমিশ্রণ ঘটে। চিত্তরঞ্জনের অমর স্মৃতিকে বিশ্বকবির অমর লেখনী দুটি মাত্র কথায় চিরস্মরণীয় করে রেখেছে :—

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

সৈয়দ আমীর আলী

দেশসেবক মনীষী



হুগলী স্কুলেব দুটি ছাত্র-বন্ধু স্কুলের লাইব্রেরী হলে সেই দিনকার একখানি সংবাদপত্র পড়ছেন। হঠাৎ বিদেশ-প্রত্যাগত একজন কৃতী মুসলমান ব্যারিষ্টারের একটি সচিত্র ছোট সংবাদ একজনের চোখে পড়তেই সে সেই দিকে তার বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো: "ভাই, আমাদের দেশে, বিশেষ করে মুসলমান-সমাজে, আজ এমন কয়েকজন আইনজ্ঞ দরকার হয়ে পড়েছে যাঁরা নিজেদের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে সমাজকল্যাণমূলক নানাবিধ আইন-কানুন করে স্ব-সম্প্রদায় ও জাতিকে প্রাণবান করে তুলতে পারেন।

—তুমিই হওনা ভাই তেমনি একজন।

সত্যিই আমার খুব বড় একজন আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার হবার সখ। আমার ইচ্ছা, আমি নানা দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সঞ্চয় করে ওগুলো আমার দেশবাসীর কল্যাণে প্রয়োগ করি।

যুবকের এই আকাঙ্ক্ষা সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়েছিল। শুধু এই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে ইনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করে এবং বিলেতে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হয়ে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

দেশে মাঝে মাঝে প্রতিভাবান লোকের সন্ধান মেলে, কিন্তু কর্মনিষ্ঠার সংগে মনীষার সম্মিলন বাস্তবিক বিরল। যে কয়জন বাঙালী তাঁদের প্রতিভার এমন সদ্ব্যবহার করে অমরত্বের অধিকারী হয়েছেন, সৈয়দ আমীর আলী তাঁদের অন্যতম।

হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৮৪৯ সালে সৈয়দ আমীর আলী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই কথাবার্তায়, চালচলনে পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পিতা তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুলের সমস্ত পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমীর আলী বৃত্তি লাভ করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার শেষ সোপান পার হতে সমর্থ হন। তাঁর ছাত্র-জীবনের প্রতিভার আরও পরিচয় এই যে, ১৮৬৭ সালে বি. এ. পাশ করে তিনি তার পর বছরেই এম. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং যথাসময়ে আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সংগে পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। দিন দিন তাঁর পসারও বেশ জমতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আমীর আলী এইভাবে ছাত্র-জীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন বটে কিন্তু তিনি কেবলমাত্র অর্থোপার্জনেই পরিতৃপ্ত থাকতে পারলেন না। আইন বিষয়ে

বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠলো ; সংগে সংগে তিনি আশা পূরণের সুযোগও পেলেন। সেই সময় এখনকার মত এত ব্যারিষ্টার ছিল না। খুব কম লোকই তখনকার দিনে দেশের মাটি ছেড়ে সাগর পাড়ি দিতেন। তখন গভর্ণমেণ্টই নিজেদের উদ্যোগে বিশেষ বৃত্তি দিয়ে মেধাবী ছাত্রদের ব্যারিষ্টারী পড়াবার জন্যে বিলেতে পাঠাতেন। এই রকম একটি বৃত্তি নিয়ে সৈয়দ আমীর আলী বিলেতে গেলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এলেন এবং পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

সৈয়দ আমীর আলী তখন সবেমাত্র তেইশ কি চব্বিশ বছরের তরুণ যুবক। এর মধ্যে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি, বুদ্ধির প্রখরতা ও চিত্তের উদারতা কি দেশীয় কি বিদেশীয় সবাইকে মোহিত করলো। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর সমর্থন, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। ইনিও তেমনি যেখানে যেমনভাবে ও যতটা সম্ভব এই সব প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা পূর্ণ করতে লাগলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত করা হলো। পরের বছরেই কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের মুসলমান-আইনের অধ্যাপক মনোনীত হয়ে পাঁচ বছরকাল তিনি অধ্যাপনায় ব্যাপৃত রইলেন। এই সময় হতে সৈয়দ আমীর আলী সাহেব মুসলমান-সম্প্রদায়ের সর্ববিধ উন্নতি সাধনে উদ্যোগী হন। এ ভাবে তাঁর কর্মময় জীবনের গণতান্ত্রিক দিকের শুরু হলো। তিনি একটিমাত্র কাজে নিজেকে চিরকাল আবদ্ধ রাখতে ভালবাসতেন না, তাঁর অপূর্ব প্রতিভা ও বিচক্ষণতার বলে পর পর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। ১৮৭৬ সালে তিনি 'কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান সঙ্ঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই সমিতির

সম্পাদক-রূপে অশেষ পরিশ্রম করে তিনি দেশের জনসাধারণের বিশেষ করে মুসলমান-সম্প্রদায়ের বহু অভাব-অভিযোগ বিদূরিত করেন। হুগলীতে দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত যে সুবিখ্যাত 'ইমামবারা' রয়েছে, তিনি দীর্ঘকাল এর কার্যনির্বাহক পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

ব্যারিষ্টারী ও অধ্যাপনা করলেও, গভর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকরীতেই সৈয়দ আমীর আলী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে পাঁচ বছর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করবার পর ১৮৭৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে কলকাতার অন্যতম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করেন। বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় তাঁকে অস্থায়ীভাবে প্রধান প্রেসিডেন্সা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হলো। সরকারী বাঁধাধরা নিয়মে বাইরের গঠনমূলক কাজ সব বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে এই চাকরীতে তাঁর মন বসলো না। যখন তাঁর এই চাকরী পাকা হবার কথা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তিনি অকাতরে এই উচ্চ পদ পরিত্যাগ করে আবার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। আইন-সভায় প্রবেশ করে তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বদেশের কল্যাণসাধনে বিশেষভাবে মনোযোগী হন। তিনি ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে আসীন ছিলেন এবং পরে কেন্দ্রীয় (ভারতীয়) ব্যবস্থা-পরিষদেরও সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায়ই 'ওয়াকফ্' আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছিল। এতে ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষ উপকৃত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'ঠাকুর আইনের অধ্যাপক' নিযুক্ত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতিভার সমাদর করেন।

ইতিমধ্যে আইন-বিষয়ে সৈয়দ আমীর আলীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। গুণমুগ্ধ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করতে বললেন।

দীর্ঘ ১৪ বছর এই দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থেকে তিনি বিচারকার্যে যে ধীরতা, বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক সময় তাঁর ইয়োরোপীয় সহকর্মীদের বিস্ময় উৎপাদন করতো। ১৯০৪ সালে তিনি গৌরবের সংগে এই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক সি আই ই. উপাধি ভূষিত হন।

সৈয়দ আমীর আলীর কর্মবহুল জীবনের মধ্যে একটা বড় জিনিষ লক্ষ্য করবার ছিল এই যে' তিনি যেন সব সময়েই ভাবতেন, কি করে বাঙালীকে তথা ভারতবাসীকে বিশ্বের দরবারে গৌরবের অধিকারী করা যায়। বাঙালা কিসে ছোট, একজন ইয়োরোপীয় বা একজন আমেরিকানই বা কিসে বড়—এই যেন ছিল তাঁর কাছে আসল প্রশ্ন। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি চেষ্টা করেছেন এই দৃষ্টান্ত দেখাতে যে, ইচ্ছা, চেষ্টা ও কর্মনিষ্ঠা থাকলে বাঙালীও যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম, বিশ্বের দরবারে বাঙালীও সকলের সমান হয়ে চলতে পারে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে সৈয়দ আমীর আলী বিলেত গেলেন। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি বিলেতেই অতিবাহিত করেছিলেন। প্রবাসে থেকেও তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর কথা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। ইংল্যাণ্ডে থেকেই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করেন। ১৯০৯ সালে আমীর আলী সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারসভা প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য-পদে নিযুক্ত হয়ে দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধনের সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আর কোনও ভারতবাসী এই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হতে পারেন নি। এর দ্বারা তিনি নিজেই যে গৌরবান্বিত হয়েছেন তাই নয়, তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষেরও এতে গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। বিলেতে থাকা কালে তিনি সেখানকার 'ভারতীয় মুস্লিম লীগ' শাখারও সভাপতি হয়েছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলী একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। সহিষ্ণুতা ও অমায়িকতা তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করেছিল। ইসলাম ধর্মের মহত্ত্ব প্রচারের জন্য তিনি আজীবন পরিশ্রম করেছেন। মুসলমান আইন ও ধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজীতে তাঁর অনেকগুলি অমূল্য গ্রন্থ আছে। আইন ও ধর্ম বিষয় ছাড়া ইতিহাস এবং সাহিত্যচর্চার প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইংরেজী ভাষায় ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষাদের মধ্যে সৈযদ আমীর আলী অন্যতম। ১৯২৯ সালে তিনি নিজেব জীবনের সব ব্রত উদ্‌যাপন করে বিলেতেব বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবেন। দেশ ও জাতি বাঙলার এই সুসন্তানের পুণ্যস্মৃতি চিরকাল শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে। কলকাতার নাগরিকগণ ‘সৈয়দ আমীর আলী এভিনিউ’ নামে একটি সুপ্রশস্ত রাস্তার নামকরণ করে পরলোকগত মনীষীর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিক



১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরীতে বৈজ্ঞানিকদের মহাসভা বসেছে। এই সভায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদেব নিমন্ত্রণ হয়েছে। তাঁবা সকলে একসঙ্গে একই সভায় বসে নিজ নিজ বিদ্যার পরিচয় দেবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ পদার্থবিদ্, কেউ রাসায়নিক, আবার কেউ নৃতত্ত্ববিদ্ ইত্যাদি; জাতিতে কেউ বা জার্ম্মাণ, কেউ বা রুশীয়, কেউ বা ইংরেজ, আবার কেউ বা আমেরিকাবাসী, সকলেই পশ্চিম মহাদেশীয় মনীষী। আর হবে নাই বা কেন? বিজ্ঞানের নবজন্ম তো পশ্চিম মহাদেশেই

হয়েছে। কাজেই সেখানকার অধিবাসীরা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে অগ্রণী হয়েছেন, তেমনি তার ফলভোগও তাঁরাই আগে করেছেন।

এক একদিন এক এক বিভাগের সভা হতে লাগলো, আর তাতে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের গবেষণার ফল সকলের সামনে প্রমাণিত করে জগৎকে অবাক করে দিতে লাগলেন।

হঠাৎ ডাক পড়লো পূর্বদেশীয় এক নবীন বৈজ্ঞানিকের। সভাস্থ সকলে উৎসুক হয়ে উঠলেন। সকলের মনেই একটা অশ্রদ্ধার ভাব।

আর তাঁদেরই বা দোষ কি? তাঁরা তো দেখেই আসছেন, বিজ্ঞান-লক্ষ্মী পশ্চিমদেশীয় লোকের ঘরেই চিরকাল বাঁধা। এরই মধ্যে এমন কা অঘটন ঘটলো যে, একজন সাধারণ ভারতীয়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সভায় শুধু আসনই দেওয়া হয় নি, নিজের গবেষণার ফল প্রমাণেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলেই কিছুটা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।—কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ? ধীরে ধীরে সভাপতির মঞ্চের দিকে এক বিয়াল্লিশ বছরের সৌম্যদর্শন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রসর হতে লাগলেন। সকলের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো।

প্রথমে তাঁর সংশয় ছিল, হয়ত তিনি যা বলছেন, তা সমবেত বৈজ্ঞানিকদের কাছে উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তিনি মন স্থির করলেন। দুঃখিনী ভারতমাতার মূর্তি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিনি স্পষ্ট দেখলেন—হয় আজ জয়লাভ, নয় চিরকালের জন্য ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত! আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে ভারতের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করে চললেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গলায় মালা দিলেন।

সভামধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। কেউ বা বিশ্বাস করলেন, আবার কেউ করলেন না; কিন্তু কারও এমন সাধ্য হলো না যে, তাঁর প্রমাণিত বিষয় মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন।

বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরলেন। সকলের মুখেই এক কথা—হ্যাঁ ভারতীয়েরা শুধু দর্শন জানেন না, বিজ্ঞান-জগতেও তাঁরা নতুন জিনিস দিতে পারেন। ভারতবর্ষ শুধু একজন স্বামী বিবেকানন্দকেই জন্ম দিতে পারে এমন নয়, সে দেশে ডঃ জগদীশ চন্দ্র বসুর মত সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবও সম্ভব।

তখন সবেমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে পৃথিবী ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি। আবার চার বছর যেতে না যেতেই আর একজন ভারতীয়—বিশেষ করে বাঙালী—নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে আপন মত প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

দেখতে দেখতে শহরময় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সকলের মুখেই এক কথা—হ্যাঁ, ডঃ বসু ভারতীয় বটেন, তবে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকও।

এই সময় একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটে। প্যারিতে 'ইফেল টাওয়ার' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্তম্ভ আছে। ডঃ বসু ও তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা অবলা বসু ওটা দেখতে গেলেন। ডঃ বসু বিজ্ঞান-কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি। কার্ড দেখাতেই তাঁর কোন প্রবেশমূল্য লাগলো না। কিন্তু শ্রীযুক্তা বসুকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) দর্শনী দিতে হলো। এদিকে একজন ইংরেজী-ভাষায় দক্ষ ফরাসী পথপ্রদর্শক (গাইড) নমস্কার করে ডঃ বসুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—Can I be of any assistance?—আমি কি আপনার সাহায্যে আসতে পারি? তিনি সম্মতি জানিয়ে

'গাইড'কে নিজের কার্ড দিলেন। কিছুক্ষণ কার্ডখানার দিকে চেয়ে থেকে গাইড অবিশ্বাসের সুরে বললেন,—Bose? Surely not Jagadish Bose? ডঃ বসু যখন জানালেন,—তিনিই জগদীশ বসু, তখন 'গাইড' অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন শ্রীযুক্তা বসুর কাছে পাঁচটি মুদ্রা দর্শনী বাবদ আদায় করা হয়েছে, তখন আর যায় কোথা! Gatemanকে সে কী ভৎর্সনা।

পরে ডঃ বসু বার্লিন, ভিয়েনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান—কেন্দ্রেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত যশ লাভ করে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে ঘুরে তাঁর মন স্বদেশের দুর্দশায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠলো। শুধু তাঁর ভাবনা হলো—কি করে তাঁর স্বদেশকে জগতের গুণীসভায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

প্যারি থেকে যখন তিনি বিলেত গেলেন, সেখানে এক বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে গবেষণার সুযোগ নেবার জন্যে এক নতুন পদের সৃষ্টি হলো। কিন্তু যখন আহ্বান এলো, তখন তিনি ঐ পদ গ্রহণে অস্বীকার করলেন। তিনি ভাবলেন, আমার একার সাফল্যই যথেষ্ট নয়, আমার দেশকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র করে গড়ে তুলবো, যেখানে দুনিয়ার লোক—

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

কিন্তু কি করে সেই বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করা যায়? কিন্তু তাঁর অপরিমিত আশা আছে, স্বদেশকে বড় করে গড়ে তুলবার আদর্শ আছে। তিনি নিরাশ হলেন না, ভয়ে পশ্চাৎপদ রইলেন না, নিজের মহিমা হতে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে লাগলেন।

১৩২৪ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেইদিন. এই স্বদেশভক্ত বৈজ্ঞানিক "ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায়" কলকাতা আপার সার্কুলার রোডে 'বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে'র (Bose Institute) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রাচীরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে নিবেদন করলেন—"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাসকে আশ্রয় করিতে হয়। ···শারীরেন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতু-নির্মিত সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই··· আরও অনেক ঘটনা আছে, যা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহার সম্বন্ধে কেবল বিশ্বাসবলেই জ্ঞান লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না। তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।···যদি মানুষ তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তাহা কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণ সাধুবাদ-শ্রবণ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে তাঁহাদের জন্যই।"

"ভারতবাসীরা ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, গবেষণা-কার্য কোন দিনই তাহাদের জন্য নহে, এই কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। মনে হইত, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের নহে।···যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম

ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন; বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সে-ই একদিন বিজিত হইবে।...যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে?...জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।...আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে, তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যে অমরত্বের অধিকারী, সে ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই...আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই, পুনরায় একদিন তাহা গগন স্পর্শ করিবেই করিবে।"

"যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু আগলাইয়া থাকে; যে জীবিত তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন-প্রবাহে একটি করিয়া উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।"

আচার্য আজ মৃত্যুর পরপারে, কিন্তু তাঁর চিরপোষিত বাসনা তাঁর জীবনকালেই সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর অসংখ্য শিষ্য-মণ্ডলী তাঁরই গবেষণামন্দিরে বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ করে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে চলেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা সাধনাদ্বারা অনুভব করেছিলেন যে, জগতের সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজ করেন—বৃক্ষে, লতায়, তৃণে, পত্রে, চন্দ্রে, সূর্যে নক্ষত্রে—সর্বত্রই তাঁর অস্তিত্ব আছে। আচার্য বসুও প্রাচীন ঋষিদের উপযুক্ত বংশধররূপে প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদ্-জগতের সংগে প্রাণিজগতের সাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদ্-জগৎও প্রাণের

চাঞ্চল্যে সজীব; মানুষের মত তাদেরও সুখ-দুঃখবোধ আছে। তাই কবি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন ঃ

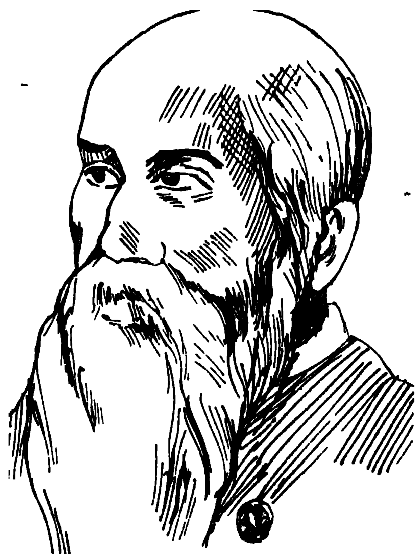
"তোমারে হেরিয়া আজি অবিরত জাগিছে স্বপনে
সেই তপোবন-শোভা—রত সবে তপস্যাচরণে।
সে উদাত্ত সামমন্ত্র, দিব্যজ্ঞানদীপ্ত প্রভা
শান্তিসুধালিপি,
প্রতি তরু-লতা-পত্রে প্রাণ-জ্যোতিঃ
ঝলসিয়া উঠে সমুদ্ভাসি
কণাদ জৈমিনি ব্যাস পতঞ্জলি গৌতম কপিল,—
তুমিও তাঁদেরি কেহ, প্রাণে অন্তরঙ্গ মিল।"

বিজ্ঞান-জগতে আচার্য বসুর স্থান দুনিয়ার সেই সব সেরা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যাঁরা নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করে পথপ্রদর্শক-স্বরূপ হয়ে আছেন,—যাঁদের আবিষ্কৃত সত্যের আভাষ ভবিষ্যৎ বংশধরদের নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে—যেমন নিউটন, ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন, কুরী, আইনষ্টাইন বা ডারউইন। তাঁকে চিরদিনই নানা বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে—তাঁর প্রথম চাকরিজীবন থেকে আরম্ভ করে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের প্রথম যুগ পর্যন্ত তাঁর ওপর কত যে আঘাত এসেছে তা যেন আমরা ভুলে না যাই। এই হলো পথপ্রদর্শকের পুরস্কার। কোন বিষয়ে অগ্রণী হবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই এটা আশীর্বাদস্বরূপ পেয়েছেন। এইরকম প্রতিকূলতায় জগদীশচন্দ্র কখনও হতাশ হননি। তিনি লিখেছেন,—"স্বার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন সফলতা ও বিফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা লাভ হইয়া থাকে, তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

আচার্যের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী আমাদের আশাহত প্রাণকে নবমী আশায় সঞ্জীবিত করে তুলুক।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ

অনাসক্ত জ্ঞানযোগী



কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র। মুখে তার প্রতিভার দীপ্তি, চোখে বিদ্যুতের ঝলক। ছাত্রটি একদিন তার কলেজের লজিকের অধ্যাপক হেষ্টি সাহেবের হাতে লজিকের একখানা বই দেখলো। বইখানি অত্যন্ত দুরূহ, তবে নামকরা প্রামাণ্য বই সেখানি। ছাত্রটি বইখানির নাম শুনেছিল আগেই। কিন্তু সেদিন অধ্যাপক হেষ্টি সাহেবের হাতে বইখানি দেখে সেখানি পড়বার তার লোভ হলো। সে সোজা অধ্যাপক হেষ্টির কাছে উপস্থিত হয়ে সেই বইখানি চাইলো, বললো—পড়েই আমি বইটি ফেরৎ দেব।

হেষ্টি সাহেব তাঁর ছাত্রের কথায় বিস্মিত হলেন। ছাত্রের অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করে তিনি বললেন, এ বইখানা পড়ে বোঝা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কোন ছাত্রের এমন সাধ্য নেই যে, এই বইয়ের মর্ম না বুঝিয়ে দিলে, সে নিজে এই বই পড়ে বুঝবে।

কিন্তু ছাত্রটি নাছোড়বান্দা। সে জেদাজিদি করতে লাগলো, বললো, দয়া করে বইখানা আমায় দিন। না বুঝতে পারি তো অবিলম্বে ফেরৎ দেব।

ছেলেটি কিছুতেই ছাড়ে না দেখে অধ্যাপক হেষ্টি বইখানা তাকে দিলেন। সে পরম উৎফুল্ল মনে বাড়ী চলে গেল।

পরদিনই ছাত্রটি বইখানা নিয়ে হেষ্টি সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে বইখানা তাঁকে ফেরৎ দিল। মাত্র একরাত্রি বাদেই ছাত্রটি বই ফেরৎ দিচ্ছে দেখে অধ্যাপক হেষ্টি ভাবলেন যে, ছাত্র নিশ্চয়ই বইখানির একবর্ণও বুঝতে পারেনি, তাই তাড়াতাড়ি সে এটি ফেরৎ দিতে এসেছে। বই ফেরৎ পেয়ে অধ্যাপক হেষ্টি তাঁর ছাত্রটিকে সোজা বললেন,—কেমন হলো, আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ বইয়ের মর্ম উপলব্ধি করা তোমার মত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ!

ছাত্রটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—না স্যার? এটা বুঝতে আমার একটুও বেগ পেতে হয়নি। বইখানি আমি আগাগোড়া পড়েছি এবং বুঝেছিও।

বালকের উত্তর শুনে অধ্যাপক হেষ্টি বিস্মিত হলেন। এই রকম একটা দুরূহ বইয়ের মর্ম ছাত্রটি একরাত্রে উপলব্ধি করেছে! কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই ছাত্রটি বইখানা পড়ে বুঝেছে কি না তা পরীক্ষা করবার জন্যই তিনি তাকে উপর্যুপরি প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ছাত্রটিও অধ্যাপকের প্রশ্নে এতটুকু বিচলিত হলো না।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর সে দিল—এমন কি বইখানির ভাল-মন্দ সমালোচনা করতেও এই তরুণ ছাত্রটি ইতস্তত করলো না। অধ্যাপক হেষ্টি এতে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হলেন এবং ছাত্রটিকে আশীর্বাদ করে বললেন, "প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একজন নবাগত ছাত্রের পক্ষে গ্রন্থখানি বুঝতে পারা আমি অসম্ভবই মনে করেছিলাম এবং এমন একখানা বই চাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে তোমায় তিরস্কার করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, তোমার প্রতিভা অদ্ভুত। তোমার জ্ঞানালোকে সমস্ত বিশ্ব একদিন উদ্ভাসিত হবে—এই প্রার্থনা আমি করছি।"—এই কথা বলে অধ্যাপক তাঁর ছাত্রের করমর্দন করলেন।

অধ্যাপকের এই আশীর্বাদ সার্থক হয়েছিল। পরিণত বয়সে এই অসামান্য বালকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রতিভাবান পুরুষটিই ভারত-গৌরব আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যে কয়জন চিন্তাশীল সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন, ভারতের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর মহামনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের তুলনা হয় না—মহাসমুদ্রের মতই তা অসীম। তাঁর জ্ঞান-গরিমায় তিনি শুধু ভারতভূমিকেই নয়, সমগ্র বিশ্বকে ধন্য করে গিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন খুব কম বিদ্যাই আছে যাতে তিনি পারদর্শিতা অর্জন না করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী এই অনাসক্ত জ্ঞানযোগী জগতের সামনে বাঙলা তথা ভারতকে তাঁর বিস্ময়কর মণীষার প্রভাবে যে কতদূর উঁচুতে উঠিয়ে গিয়েছেন তা তাঁর দেশবাসী আমরা আজও হয়ত সঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। সত্যি সত্যিই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা, তাঁর মহৎ গুণাবলী যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা খুব কষ্টসাধ্য এবং সাধারণ লোকের পক্ষে তা সম্ভবও নয়।

প্রাচীন কালের ঋষিদের জ্ঞান-শিক্ষা ব্রজেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে নতুন ভাবে প্রদীপ্ত হয়েছে।

বয়সে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র প্রভৃতিও এঁর প্রায় সমসাময়িক। একই সময়ে বাঙলার কোলে এতগুলি সুসন্তান আর বড় দেখা যায়নি। এঁরাই বাঙলা মায়ের রত্নপ্রসূ নামকে সার্থক করেছেন। এঁদের আদর্শ সামনে রেখে বাঙলার তারুণ্য গড়ে উঠুক।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রলাল শীল কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ও ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাধুপ্রকৃতি ছিল তাঁর ব্যবসায়-জীবনের প্রধান অন্তরায়। কোন মোকর্দমা গ্রহণ করবার আগে তিনি অন্ততঃ ছয়-সাত বার বিচার করে দেখতেন, ওটা নিজের যোগ্য সম্মান রক্ষা করে পরিচালনা করতে পারবেন কিনা। এমনতর লোকের কি পসার হয়? মহেন্দ্রলালের পসার হলো না। কিন্তু অর্থ-সম্পদের লালসাকে তিনি জয় করেছিলেন, পার্থিব সুখ-সম্পদ ছিল তাঁর লক্ষ্যের বাইরে। এর ফলে মাত্র ৩২ বছর বয়সে মহেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারবর্গকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহেন্দ্রলালের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সাত বৎসরের শিশু। পিতৃবিয়োগের পরেই তাঁকে তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে মামার বাড়ী চলে আসতে হয়েছিল। তাঁর মামার অবস্থাও খুব সচ্ছল ছিল না। অতি কষ্টে দুই ভাই মানুষ হতে লাগলেন। তাঁদের বাল্যকালের কাহিনী বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। দুঃখ মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলে, দুঃখের অভিজ্ঞতাই জীবনে পরম সম্পদ এনে দেয়, দুঃখই পরম মিত্ররূপে মানুষকে শ্রেয়ের পথে টেনে নিয়ে যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বাল্যজীবনেই এই শিক্ষা পেয়েছিলেন।

বাল্যকালেই ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রগণকে বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়তে হতো। তখন গ্রীষ্মের ছুটি থাকতো মাত্র এক মাস। ব্রজেন্দ্রনাথ এই এক মাসের মধ্যে তাঁর পাঠ্য বীজগণিত বইখানি আগাগোড়া আয়ত্ত করেছিলেন এবং পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এর পর হতে বিদ্যাভ্যাসে তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যেতে লাগলো। তিনি উচ্চতর গণিত অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এক বৎসর যেতে না যেতেই তিনি এতদূর পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি অনেক সময়ে অনেক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করে তাঁর স্কুলের শিক্ষককেও বিস্মিত করতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রই ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের একমাত্র প্রিয় বিষয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হলেন এবং জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্তি হলেন। হেষ্টি সাহেবের কাছে অধ্যয়ন করে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মালো। ব্রজেন্দ্রনাথ যা একবার পাঠ করতে আরম্ভ করতেন, তা শেষ পর্যন্ত পড়ে তবে ছাড়তেন। এক সময়ে তিনি যেমন গণিতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবার তেমনি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করলেন। তিনি কলেজে পড়েছিলেন পাঁচ বছর। এমন বিষয় একটিও ছিল না, যা তিনি এই পাঁচ বছরে পড়েন নি। ইংরেজী, ইতিহাস, ব্যবহার-শাস্ত্র, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব সমস্ত কিছুই তিনি এই অল্প দিনের মধ্যে অধ্যয়ন করেছিলেন। ভাসা-ভাসা জ্ঞান তিনি পছন্দ করতেন না যা পড়তেন ভালভাবেই পড়তেন। তাঁর পাঠের গভীরতা ও ব্যাপকতা কতদূর ছিল, তা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যাবে। ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নকালে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম সাহিত্য (চসারের পূর্বেকার), এমন কি স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের পল্লীগাথাগুলি পর্যন্ত বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি আধুনিক ও মধ্যযুগের

ইয়োরোপীয় দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব পড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত অসাধারণ ছিল যে, তিনি কখনও কিছু ভুলতেন না। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত তাঁর নখদর্পণে ছিল। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত, হিন্দু-দর্শন ও সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে বিদ্যা বলতে ব্রজেন্দ্রনাথের অজ্ঞেয় কিছুই ছিল না। তিনি সময় সময় বলতেন, প্রাকৃত-বিজ্ঞানে ও পদার্থশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান কম। কিন্তু তবুও বলতে কি, কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞও এই সব বিষয়ে তাঁর বিদ্যাবত্তায় অবাক হয়েছেন।

এমন কোন বিষয় ছিল না, যাতে তাঁর রুচির অভাব ছিল। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যা-বিশারদ। এক ভদ্রলোক একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ কতকগুলি ম্যাপ ও চার্ট চারদিকে ছড়িয়ে বসেছেন। তখন তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের মনীষা ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক উর্ধে। দুরূহ বিষয়গুলিকে তিনি আপনার করে নিতেন। জটিল ও কঠিন বিষয়েই তিনি অসীম আনন্দ পেতেন।

যাঁরা ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা জানেন, কি গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করতেন। পৃথিবীর শত কোলাহলও ব্রজেন্দ্রনাথের তপস্যা ভাঙতে পারতো না। তিনি ছিলেন যোগীর মতই অধ্যয়নশীল- জ্ঞানের ধ্যানগম্ভীর বিরাট হিমগিরি ব্রজেন্দ্রনাথ যখনই কিছু পড়তেন তখনই তার দোষ-গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সব কিছুই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো, কোন টীকা ভাষ্যাদির দরকার হতো না। পড়ার সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এমন তদ্গতচিত্ততা, তন্ময়তা খুব কমই দেখা যায়। এমন অনেক দিন গিয়েছে, তিনি হয়ত সন্ধ্যাবেলায় পড়তে

বসেছেন এবং যখন পড়া শেষ করে উঠেছেন, তখন পরদিন দুপুর বেলা। বর্তমান যুগে এমন তপস্বী বড় দেখা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বহুভাষাবিদ ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া তিনি ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, লাটিন, গ্রীক, পারসী, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাও বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতের অনেক প্রাদেশিক ভাষাও তাঁর জানা ছিল।

যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ পড়ার সময়ে বাহ্যজ্ঞানহীন দার্শনিক ছিলেন, তবুও তাঁর কর্মশক্তির অভাব ছিল না। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। কর্তব্যকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল; অনিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের তিনি পছন্দ করতেন না। কলেজের ছোটখাটো সব কাজই তিনি নিজের হাতে করতেন; এমন কি ছেলেদের আবেদন-পত্রে অধ্যক্ষের যা কিছু লিখতে হয়, তিনি নিজেই সমস্ত লিখে স্বাক্ষর করে দিতেন, কেরাণীর লেখায় স্বাক্ষর করতেন না। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে এর উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাও তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতার পরিচয় বহন করে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি মহীশূরের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের যৌবনেই তাঁর পত্নী-বিয়োগ ঘটে। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার দাশের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন; কিন্তু বসন্তকুমারের অকাল মৃত্যুতে তাঁর কন্যা অল্প বয়সেই বিধবা হন। এই নিদারুণ শোক ব্রজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ধীরভাবে সহ্য করেছিলেন। তাঁর এই কন্যা ও জ্যেষ্ঠপুত্র বিলাতে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

১৯১১ সালে লণ্ডনে বিশ্বজাতি-সম্মেলনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ আহূত হয়েছিলেন এবং সেই সভায় অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে

তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করেছিলেন। শতাধিকবর্ষ পূর্বে বঙ্গঋষি রামমোহনের কণ্ঠে যেমন প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনগাথা উদ্‌গীত হয়েছিল, এযুগে আবার তাঁরই ভাবানুজ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ মিলন-মহোৎসবে উদ্বোধনগীতি উচ্চারণ করলেন। বাস্তবিকই ব্রজেন্দ্রনাথের মত রামমোহনের এমন মন্ত্রশিষ্য এ যুগে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিগত বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনও তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁকে এমন সম্মান করতেন, তাঁর প্রতিভার পরিচয় আমরা অনেকেই জানি না। বিদেশে তাঁর গলায় বরমাল্য অর্পিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু তাঁরই দেশবাসীর কাছে তিনি তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেন নি– সেজন্য তাঁর কোন দুঃখ ছিল না, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থই অনাসক্ত জ্ঞানযোগী। সংসারের কোলাহল হতে তিনি দূরে থাকতে চাইতেন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত। যশের আকাঙ্ক্ষা, বাহ্যাড়ম্বর, সম্মান, প্রতিপত্তি, পাণ্ডিত্যাভিমান প্রভৃতি কিছুই তাঁকে বিচলিত বা কলুষিত করতে পারে নি। তিনি ছিলেন পণ্ডিত অথচ শিশুর মত সরল। তাঁকে স্বয়ং স্বয়ম্ভু বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই তাঁকে বুঝবার চেষ্টা ও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ

দেশলক্ষ্মীর বরপুত্র



আগ্রার তাজমহল। শাজাহানেব অমর কীর্তি, পৃথিবীব সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম নির্দর্শন। এই তাজমহলের সামনে বারো-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে প্রতিদিন বসে থাকতো, বসে বসে অবাক বিস্ময়ে তাজের কারুকার্য দেখতো। ছেলেটি আগ্রাব সেণ্ট্ জন্ কলেজিয়েট্ স্কুলে পড়তো। অবসর পেলেই সে ঘরে স্থির থাকতে পারতো না—ছুটে গিয়ে উপস্থিত হতো তাজমহলের পাদদেশে, তাজমহলের শিল্পনৈপুণ্য, শোভাসৌন্দর্য দেখবার জন্য।

তাজমহলের নির্মাণ-কৌশল এই ছেলেটির মনে এক নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললো। তাজমহল দেখতে দেখতে ভাবতে থাকে, সে যদি বড় হয়ে এমনি একটি স্মৃতি-সৌধ গড়তে পারতো! সে সঙ্কল্প করলো যে, সে শিল্পী হবে—ইঞ্জিনিয়ার হবে—অন্তত একজন রাজমিস্ত্রী হবে।

শিশুমনের এই আকাঙ্ক্ষা, এই স্বপ্ন মিথ্যা হয় নি। কলকাতার গড়ের মাঠের উপরে 'ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ'টি গড়ে এই কিশোর বালক তার কৈশোরের স্বপ্ন সার্থক করে তোলে। শুধু 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' নয়, বেঙ্গল এ্যাসেম্বলি হাউস, ক্যালকাটা ক্লাব, কালীঘাটের মহীশূর স্মৃতি-ভবন, হাইজিন ইন্‌ষ্টিটিউট, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, হংকং ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পার্ক ম্যানসান প্রভৃতি কলকাতার বহু সুরম্য প্রাসাদ এই বালকটিরই পরিণত প্রতিভার প্রমাণ দিচ্ছে। ভারতের মধ্যে শিল্প-জগতে বাঙলা আজ যে জায়গাটুকু করে নিয়েছে তার সূচনা প্রকৃতপক্ষে এই বালকটিই বড় হয়ে করে ছিলেন। এই অদ্ভুতকর্মা মনীষীর নাম স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরাধিকারসূত্রে যারা পিতামাতার অগাধ ধনসম্পত্তি লাভ করে, তাদের পক্ষে বিখ্যাত হওয়া বা প্রভূত ধনসঞ্চয় করা কঠিন নয়। কিন্তু সহায়সম্বলহীনভাবে যাঁরা কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিখ্যাত হন বা ধনলাভ করেন, তাঁরা সত্যিই আদর্শ মানুষ। স্যার রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনিই একজন আদর্শ পুরুষ। রাজেন্দ্রনাথের প্রথম জীবন দারিদ্রের কঠোরতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প আর অধ্যবসায়ের বলে তিনি লক্ষ্মীর বরলাভ করে অগাধ ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভ্যাবলা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর মা উত্তমশীলা, স্নেহময়ী ও বিদুষী ছিলেন। পিতার

মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রনাথের মায়ের উপরই তাঁর সমস্ত দায়িত্বভার পড়ে। শৈশব হতেই যে চরিত্রবল ও কর্মপটুতার নিদর্শন রাজেন্দ্রনাথের জীবনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তাঁর মহীয়সী মায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে যশ, মান ও খ্যাতির সুষমায় মহিম-মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের মত রাজেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের আশীর্বাদেই কমলা ছিলেন তাঁর প্রতি চিরপ্রসন্না। রাজেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তির একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। রাজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন আগ্রায়। শিক্ষালাভে তাঁর একাগ্রতা ছিল এমনই প্রগাঢ় যে, কারো কোন কথাতেই তাঁর মনকে সহজে টলানো যেতো না। ইতিমধ্যে তিনি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন খবর পেলেন যে, তাঁর চির-আরাধ্যা মাতৃদেবী পীড়িতা। সেই খবর পেয়ে তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না। আগ্রায় বিদ্যার্জনের সকল চেষ্টা ত্যাগ করে তিনি ছুটে এলেন সুদূর বাঙলার পল্লীকুটীরে স্বহস্তে মায়ের সেবা করবার জন্যে। কিন্তু ঘরে ফিরেই স্নেহময়ী মাকে দরজার সামনে অপেক্ষা করতে দেখে রাজেন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন এবং প্রফুল্ল মনে মায়ের পদধূলি নিলেন। পরে জানা গেল রাজেন্দ্র-জননী এক দুঃস্বপ্ন দেখে পুত্রকে দেখবার জন্য উতলা হয়ে অপরকে দিয়ে নিজের গুরুতর পীড়ার কথা লিখিয়েছিলেন; কারণ তিনি জানতেন যে অন্য কোন অজুহাতে তাঁকে আনা যেতো না।

আগ্রা হতে তিনি কলকাতায় এসে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে যোগদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিকে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ ও অন্যদিকে শারীরিক

অসুস্থতা—এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে তাঁকে সেই সময় বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রনাথ দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি বন্ধুবর্গের চেষ্টায় অতি অল্প বেতনে একটি স্কুলে শিক্ষকতা সংগ্রহ করে কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় সেই বিষয়ের ওপর তাঁর যে গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্কুল-মাষ্টারির পরিশ্রম ও অভাব-অনটনের মধ্যে তা লুপ্ত হয়ে যায় নি।

তখন আলিপুরের চিড়িয়াখানা তৈরী হচ্ছিল। তিনি প্রায়ই সেখানে গিয়ে অসীম ধৈর্য ও আগ্রহ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের কার্য-কৌশল লক্ষ্য করতেন। এখানেই তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হয়। একদিন রাজেন্দ্রনাথ চিড়িয়াখানা তৈরী দেখতে গিয়েছেন। দেখলেন যে কলকাতা কার্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার লেসলী সাহেব মিস্ত্রীদের আধা-হিন্দী আধা-ইংরেজীতে বাগানের ছোট একটা সেতু তৈরী করবার কৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মিস্ত্রীরা কিছুতেই সাহেবের কথা বুঝতে পারছে না। রাজেন্দ্রনাথ সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি সাহেবকে থামিয়ে জিনিসটা মিস্ত্রীদের বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। ফলে লেসলী সাহেব খুশী হয়ে রাজেন্দ্রনাথকে বললেন, "তুমি একদিন পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

নির্দিষ্ট দিনে রাজেন্দ্রনাথ সাহেবের সংগে দেখা করলেন। সাহেব সেদিন চিড়িয়াখানাতেই বুঝেছিলেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যেটা এই তরুণ যুবক রাজেন্দ্রনাথের বেশ ভাল রকমই জানা আছে। তাই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র তিনি সেদিন তাঁকে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে একটা ছোটখাটো কণ্ট্রাক্টের কাজ দিলেন। কিন্তু কণ্ট্রাক্ট পেয়ে রাজেন্দ্রনাথ মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি তখন মাত্র পনের টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টার—অতি কষ্টে মেসের খরচ চালিয়ে টিকে আছেন। কণ্ট্রাক্টের কাজ করার জন্যে

যে মূলধনের দরকার তা তিনি পাবেন কোথায়? কিন্তু রাজেন্দ্র-নাথ দমলেন না। তাঁর জীবনের সঙ্কল্প—তিনি ইঞ্জিনিয়ার হবেন—সেই সঙ্কল্প সফল হতে চলেছে। সুতরাং তিনি নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম না হয়ে বহুকষ্টে টাকার জোগাড় করে কাজ শেষ করে সাহেবকে খুশী করলেন। আপন প্রতিভাবলে তিনি এই কাজে এমন সুনাম অর্জন করলেন যে, টি. সি. মুখার্জি এণ্ড কোম্পানীর ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তাঁকে তৎক্ষণাৎ তাঁর কারবারের অংশীদার করে নিলেন।

আগ্রায় জলের কল বসাবার পরিকল্পনার কণ্ট্রাক্ট নিতে গিয়ে রাজেন্দ্রনাথ একবার মুস্কিলে পড়েছিলেন। শ্বেতাঙ্গ কণ্ট্রাক্টরদের পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি ঐ কাজে সফলকাম হতে পারেন নি। পরে তিনি ওয়ালস্ লোভেট এণ্ড কোম্পানী নামে এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কিছুদিন কাজ করেন। কিন্তু একজন বাঙালীর এই রকম প্রতিভা বিদেশীয়দের বরদাস্ত হলো না। কাজেই ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ তাঁর সঙ্গে অসংগত ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে একজন বড় অংশীদার মিঃ টমাস একুইন মার্টিন রাজেন্দ্রনাথের কর্মকুশলতা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ঐ কোম্পানীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাজেন্দ্রনাথকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করে মার্টিন কোম্পানী নামে এক নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজেন্দ্রনাথের একাগ্রতা ও সহযোগিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মার্টিন কোম্পানী অভাবনীয় উন্নতি লাভ করলো এবং ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রনাথই ঐ কোম্পানীর সর্বপ্রধান অংশীদার এবং সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন।

রাজেন্দ্রনাথ যে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর মানসিক শক্তি যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর সর্বময় প্রভুত্ব-লাভের প্রচেষ্টায়। কলকাতা কর্পো-

রেশনের ড্রেন নির্মাণের ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে এক সময় বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর একজন শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারের সংঘর্ষ হয়। সেই দিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন একদিন এর উপযুক্ত উত্তর দিতে হবে। ১৯২৭ সালে বার্ণ কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে কিনে তিনি তাঁর ঐ প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের কর্মশক্তি কেবলমাত্র ব্যবসায়-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯১০ সালে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের সভাপতি পদে মনোনীত হন। তার পরবছরেই কলকাতার শেরিফ হবার সম্মান লাভ করেন। তিনি ১৯০১ সালে সি. আই. ই., ১৯১১ সালে কে. সি. আই. ই. এবং ১৯২২ সালে কে. সি. ভি. ও. উপাধি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানাত্মক ডি. এস-সি. উপাধি দেওয়া হয়েছিল। হাওড়া ব্রীজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কমিটির সদস্য, ইণ্ডিয়ান কোল কমিটির সদস্য, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি বিভিন্ন দিকে তাঁর অসামান্য কর্মশক্তি দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাজেন্দ্রনাথ একজন উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্যি, কিন্তু কোন রকম গোঁড়ামিই তিনি পছন্দ করতেন না। যে ধর্মের যা কিছু শুভ তাই গ্রহণ করে অশুভ সবকিছু বর্জন করা তাঁর চিরকালের স্বভাব ছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্মকেই রাজেন্দ্রনাথ জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। কর্মকেই তিনি ধর্ম বলে মানতেন। তাঁর কর্মস্পৃহা, চরিত্রবল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ের মূল্যজ্ঞান সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত।

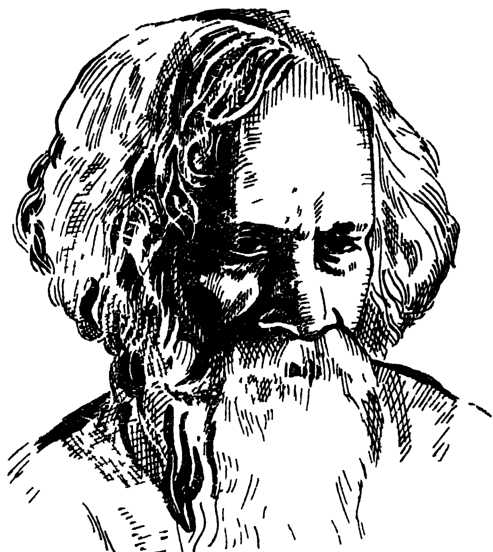
রাজেন্দ্রনাথ যদিও কোন দিনই রাজনীতিজ্ঞ হতে চাননি তবুও তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের সমস্যা সম্যধানের প্রস্তাব তিনিই সর্বপ্রথম উত্থাপন করেছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে অর্থাভাব খুবই ছিল, তখন তিনি দারিদ্র্যের জ্বালা পূর্ণমাত্রাতেই অনুভব করেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রচুর অর্থোপার্জন করে তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর দানশীলতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েক বছর আগে ১৯৩৬ সালে কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথের গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটেছে। বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, প্রতিভার বরপুত্র, নিরহঙ্কার, মাতৃভক্ত ও দানশীল রাজেন্দ্রনাথের স্মৃতি যে বাঙালী জাতিকে যুগে যুগে উন্নতির পথে অনুপ্রেরণা দেবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

জগৎ-পূজ্য মহামানব



ছোট্ট একটা ছেলে। ছেলেটি একদিন দেখলো, তার দাদা আর বয়োজ্যেষ্ঠ এক ভাগ্নে স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছেন। ওদের স্কুলে যেতে দেখে ছেলেটির বড় সখ হলো যে সেও স্কুলে যায়। এর আগে ছেলেটি কখনও গাড়ী চড়ে নি বা বাড়ীর বাইরে যায় নি। সেইজন্যে যখন সে দেখলো, তার দাদা আর ভাগ্নে গাড়ী চড়ে স্কুলে যাবার আয়োজন করছেন, তখন সে বায়না ধরলো, সেও স্কুলে যাবে। কিন্তু সে যে তখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ! তাই তার কান্না, তার আবদার—কিছুতেই কিছু হলো না। সে বাড়ীতে পড়ে রইলো। তার দাদা আর ভাগ্নেটি স্কুলে গেলেন।

ছেলেটির দাদা আর ভাগ্নে রোজই স্কুলে যান, স্কুল থেকে ফিরে এসে তাঁরা এমন করে কলকাতার রাস্তার কথা, স্কুলের কথা ফলাও করে ছেলেটির কাছে বলতে থাকেন যে, তা শুনে ছেলেটির মন আর কিছুতেই ঘরে টিকতে চাইতো না। সে রোজ তার দাদা আর ভাগ্নের স্কুল-যাওয়ার গল্প শুনতো, আর স্কুলে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে ছেলেটিকে এমনি ব্যাকুল দেখে ছেলেটির গৃহশিক্ষক একদিন বললেন, "এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদছো, স্কুলে ভর্তি হলে স্কুলে না-যাবার জন্যে তার চেয়ে আরও অনেক বেশী কাঁদবে।

মাষ্টার মশায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল—একদিন এই ছেলে স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে কেঁদেছিল কিন্তু স্কুলে ভর্তি হয়ে এই ছেলেই স্কুলে না যাবার জন্যে অনেক বেশী কেঁদেছিল। এর কারণ লেখাপড়ার প্রতি ছেলেটির বিরাগ নয়। এর কারণ—বিদ্যালয়-জীবন ছেলেটির কাছে দুঃসহ বলে মনে হতো। বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়মকানুন, সেখানকার কঠোর শাসনপ্রণালী—পড়া না বলতে পারলে শাস্তি প্রভৃতি দেখে ছেলেটির মন বিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলো। স্কুলের ঘরগুলা তার কাছে নির্মম বলে মনে হতো, দেওয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মত মনে হতো।

এই যে ছেলে—ইনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬১ সালের ৭ই মে (বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরপরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ বেশী রাত পর্যন্ত পড়তে পারতেন না। স্কুলে পড়তেও তাঁর ভাল লাগতো না। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে, নর্মাল স্কুলে, বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গি

স্কুলে আর বিলেতের ব্রাইটন শহরের একটি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য ও কৈশোরে পড়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাকামী কবির মন কোন বিদ্যালয়েই টিকতো না। যে ক'টি বিদ্যালয়ে তিনি পড়েছিলেন তার প্রত্যেকটিকে তাঁর মনে হতো যেন এক একটি খোপওয়ালা বড় বাক্স। তাই স্কুলে ভর্তি হয়ে রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যেতে চাইতেন না—তিনি স্কুল পালাতেন।

পড়ার প্রতি যাতে দেশের ছেলেদের মনে ভয় জন্মে না যায়, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মুক্ত আবেষ্টনীর মধ্যে তাদের লেখাপড়া শিখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে।

মুক্তিকামী বালক কবি স্কুল পালাতেন, এবং তিনি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখেন নি ঠিকই,—কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনদিনও এতটুকু উদাসীনতা দেখা যায় নি। স্কুলে না পড়ে—কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় আর পিতার শিক্ষায় বাড়ীতে পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে রকম পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই ফারসী, সংস্কৃত, ও ইংরেজী শিখেছিলেন এবং বালক বয়সেই তিনি পারস্যের কবি হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন, সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করতেন, কবি কালীদাসের সংস্কৃত গ্রন্থ 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি পড়ে ফেলেছিলেন, ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেলী, সেক্সপীয়ার প্রভৃতির কাব্য ও নাটক পড়ে শেষ করেছিলেন। আর বাংলা বইয়ের ত কথাই নেই। সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের কলেবর ছিল ক্ষীণ। তখন বাংলা সাহিত্যের যে ক'খানি বই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রায় সে সবই রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য-নাটক, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক আর বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন—কিছুই আর কবির পড়তে বাকী ছিল না। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন, "আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ

ছিল। বোধ করি পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কয়টা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম"।

ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ এমন সব বই পড়ে ফেলেছিলেন, যার নাম পর্যন্ত তাঁর ক্লাসের ছেলেরা বা তাঁর সমবয়সী ছেলেরা জানতো না। কাজেই স্কুলে পড়াশুনা না করলেও তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যা বড় কম হয়নি। যে বয়সে ছেলেরা সাধারণত ইংরেজি প্রাইমার পড়ে এবং সামান্য যোগবিয়োগের অঙ্ক কষে থাকে, সেই বয়সে তিনি পড়তেন সেক্সপীয়রের নাটক, রে শলীকাব্য, সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, জ্যামিতি ও বিজ্ঞান।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ শুধু পাঠ মুখস্থই করেননি; তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স সেই সময় থেকেই তিনি আবৃত্তিও অভ্যাস করতেন। রামায়ণ-মহাভারতই তখন তিনি বেশী করে আবৃত্তি করতেন। ছেলেবেলাতে এরকম আবৃত্তি অনুশীলন করতে শুরু করায় উত্তরকালে তিনি একজন বিশ্ব-বিখ্যাত আবৃত্তি-কারক হিসেবে পরিচিত হন। যে কেউ এবং যে কোন দেশের লোক তাঁর আবৃত্তি শুনেছেন, তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন। গান আর ছবি আঁকার প্রতিও ছেলেবেলাতেই কবির আসক্তি জন্মে। একবার পিতাকে একটি গান শুনিয়ে তিনি এত মুগ্ধ করেছিলেন যে, তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ খুশী হয়ে তাঁকে একটি পাঁচশত টাকার চেক দিয়েছিলেন। আবৃত্তির মত সঙ্গীতেও তাঁর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা ছিল অবর্ণনীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালেই কবিতা রচনা করতে শিখেছিলেন। তাঁর বয়স যখন তের-চৌদ্দ, সেই সময়েই তিনি অজস্র কবিতা রচনা করেছিলেন। আর শুধু রচনা করা নয়, সেই সব কবিতা রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার শ্রেষ্ঠ সব মাসিক পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। কবির যখন ষোল বছর বয়স—অর্থাৎ যে বয়সে ছেলেরা সাধারণত প্রবেশিকা পরীক্ষার গণ্ডি সবেমাত্র পার হয়—সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের বহু খণ্ড-কবিতা, তিন চারখানি

কাব্য আর অনেকগুলি চমৎকার চমৎকার গদ্য-রচনা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল', প্রথম উপন্যাস 'ঝরণা', 'ভিখারিণী' নামে বড় গল্প, আর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'—এ সবই রবীন্দ্রনাথ কৈশোরের প্রান্তে উপনীত হবার আগেই রচনা করেছিলেন।

বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কবিতা লিখতে শেখান তাঁর এক ভাগ্নে। ইনি কবির চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন,—এঁর নাম জ্যোতিপ্রকাশ। জ্যোতিপ্রকাশের কাছে কবিতা রচনার প্রথম পাঠ শিখে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং নতুন কবিতা লিখতে শিখে যখনই তিনি হাতের কাছে কাগজের টুকরো পেতেন তখনই কবিতা রচনা করে কাগজখানিকে ভরিয়ে ফেলতেন। এর পর বাড়ীর এক কর্মচারীর কাছ থেকে একখানা নীল কাগজের খাতা চেয়ে নিয়ে ওটাতে বহু কবিতা রচনা করে তিনি খাতাখানি ভরে ফেললেন।

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ—বাঙলা সাহিত্য তাঁর দানে কত যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

সাহিত্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যাচার্য' (ডি. লিট্) এই সম্মানজনক উপাধি দিয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে উক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ইউরোপে যুদ্ধ চলতে থাকায় এবং রবীন্দ্রনাথও অসুস্থ থাকায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণকে বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে এসে এই উপাধি প্রদান করতে হয়েছে। তাঁর অতুলনীয় কাব্য-প্রতিভার জন্যে "কবীন্দ্র" ও "কবিগুরু" আখ্যাতেও তিনি সচরাচর পরিচিত হতেন।

বীরেন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে ছিলেন—কলকাতার বিখ্যাত ধনী

পরিবার ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর জন্ম। কিন্তু বড়লোকের ছেলের মত আদর-যত্ন তিনি কোন দিনও পাননি। এমন কি, ভাল জামা-কাপড় পর্যন্ত তিনি পরতে পেতেন না। বলতে গেলে চাকর-বাকরই ছিল তাঁর অভিভাবক। সামান্য ত্রুটির জন্যে তাঁকে চাকরের হাতে মার পর্যন্ত খেতে হয়েছে। সেইজন্যে তিনি বাল্যে বিলাসিতা শিখবার অবসর পাননি কিংবা পরবর্তী জীবনে কখনও অন্যায় বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি। অহেতুক সখ তিনি কোন দিনই পছন্দ করতেন না। একবার তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর স্ত্রী সখ করে তাঁকে একটি সোনার আংটি দিয়েছিলেন। এতে রবীন্দ্রনাথ খুশী তো হলেনই না, বরং স্ত্রীকে এজন্যে ভৎ'সনা করেছিলেন। পুরুষমানুষ সোনার গহনা পরবে, এটা ছিল তাঁর সংস্কারের বাইরে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন সুবিখ্যাত কবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সমালোচক। বর্তমান যুগে তাঁর মত সর্বতোমুখী প্রতিভা আর দেখা যায় না। এমন কি শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে, চিকিৎসা-বিদ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ভাল বাইওকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে পারতেন। তিনি যে বিষয়েই কলম ধরেছেন তাতেই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ফুটে উঠেছে। তিনি বহু গদ্য ও পদ্য লিখে অতুলনীয় যশ অর্জন করেছেন। এখানে তাঁর সমস্ত বইয়ের তালিকা দেওয়া অসম্ভব। 'গীতাঞ্জলি' তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এই কাব্যের জন্যই তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর সুইডিস একাডেমী তাঁকে সাহিত্যের জন্যে এই পুরস্কার দেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার এই সর্বোচ্চ সম্মান সর্বপ্রথম লাভ করেন। তাঁর পর আর একজন ভারতবাসীর এই সম্মান লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। পদার্থ-বিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ৮১ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি তরুণ, তাঁর যৌবন ছিল যেন চির-অচঞ্চল। তাঁর প্রতি কাজে, কল্পনায়, হাসি-পরিহাসে, কথা-বার্তায় সর্বত্রই তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। বাঙালীর জীবনে এটা যেন স্বপ্ন, একটা বিরাট বিস্ময়। শেষ জীবনে একদিন রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্পপ্রসঙ্গে উপহাস করে বলেছিলেন—"আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, ভয় পেয়োনা তাই বলে। মনটা আজও তোমাদের মতো রঙিন, আজও আমি তোমাদেরই মতো তরুণ।" রবীন্দ্রনাথ ছোটদের খুব ভালবাসতেন। তাদের জন্যে তিনি অনেক গল্প ও কবিতা লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের যশসৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে থাকে। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, যাভা, পারস্য প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই অশেষ সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীগুলি অনবদ্য জ্ঞানসম্ভারে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বা পরে ভারতবর্ষে এরূপ ভ্রমণ-কাহিনী আর কেউ লিখতে সক্ষম হননি।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমেরও তুলনা হয় না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জন বাঙলাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। এর প্রতিবাদে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তিনি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি সরকার-প্রদত্ত "স্যার" উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। তাঁর জীবনের এক-একটি দিক নিয়ে এক একটি বিরাট গ্রন্থ হতে পারে। ১৩৪৭ সনের ২৫শে

বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ একাশী বছর বয়সে পদার্পন করেন। দেশের ও বিদেশের বহু মনীষী এই উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন,—"আপনার জীবনের চার কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে, পাঁচ কুড়ি বছর ধরে জীবিত থাকুন, এই প্রার্থনা।" উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, "চার কুড়ি বছর বেঁচে থেকে যথেষ্ট বেয়াদপি করেছি, পাঁচ কুড়ি বাঁচলে সেটা অসহ্য হয়ে উঠবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই পরিহাস যে খুব শীগ্রি সত্যি হবে কেউ তা ভাবতেও পারেনি। আষাঢ় মাসের শেষভাগে তাঁকে কলকাতায় আনিয়ে একটা অস্ত্রোপচার করা হলো, কিন্তু রোগ সারলো না। ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর শবযাত্রায় কলকাতা শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা যেভাবে দলে দলে যোগ দিয়েছিল, তাতেই বোঝা যায় জাতির তিনি কতখানি আপন ছিলেন। সর্বভারতীয় মনীষীরা তাঁর অলৌকিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বিলেতেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে শোক-সভা হয়েছে।

বোলপুরের 'শান্তিনিকেতন' এবং 'বিশ্বভারতী" রবীন্দ্রনাথের বিরাট কীর্তি। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর নানাদেশ থেকে আগত পণ্ডিতগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত আছেন। আমাদের কর্তব্য, কবির এই শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে আপ্রাণ সাধনায় বাঁচিয়ে রাখা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আদর্শ শিক্ষাগুরু



বহুদিন আগের কথা। কলকাতায় এক বিরাট সভা হবে। কাগজে কাগজে ঘোষণা করা হয়েছে,—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

ঠিক ছ'টায় সভা বসবার কথা। পনের মিনিট বা আধঘণ্টা দেরী হলেও বিশেষ যাবে আসবে না; কেননা ঘোষিত সময়ে সভা সাধারণত হয় না, এইটাই লোকের ধারণা। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

কিন্তু এ কি! ছ'টা পনের মিনিটে সভাস্থলে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য ; তিলধারণের স্থান নেই। বহু কষ্টে ভিড়ের ভিতর একটু স্থান করে নিলাম।

এত পরিশ্রমও বুঝি বৃথা হলো! মঞ্চের দিকে চেয়ে সভাপতিকে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু তিনি কই? হতাশ হয়ে পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—"মশাই, পি. সি. রায় কোথায়? তিনি কি আসেন নি?"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে কোন উত্তর না দিয়ে বিরক্তভাবে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বক্তার দিকে চেয়ে রইলেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না। কিছুটা অধীর হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—"পি. সি. রায় কি এখনও আসেন নি?" এবারে ভদ্রলোক নিতান্ত বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন,—"মশাই, কলকাতায় নতুন এসেছেন নাকি?"

ভদ্রলোকের মেজাজ দেখে আমিও গরম হয়ে উঠলাম। অবস্থা রীতিমত গুরুতর বুঝে উপস্থিত অন্যান্য লোকজন আমাদেব দিকে নজর দিলেন। আমাদের উভয়ের কথা শুনে তাঁদেরই একজন হেসে বললেন,—"ওঃ বুঝ্‌তে পেরেছি।" আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন,—"আপনি কখনও পি. সি. রায়কে দেখেন নি, না? তবে আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" মঞ্চের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, রুগ্ন, কঙ্কালসার, খর্বাকৃতি, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িযুক্ত, উস্কুখুস্কু-চুল-বিশিষ্ট, খদ্দরের কোট ও ধুতি পরিহিত এক সাধারণ বৃদ্ধকে। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আবার চাইলাম। ভাবটা যেন এই,—"এ লোক কি পি. সি. রায় হতে পারে? তিনি হবেন বিরাট পুরুষ,—যাঁর দিকে চাইলে মাথা আপনিই নত হ'য়ে আসে।"

ভদ্রলোক আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন,—

"শোনেন নি, যে সভায় পি. সি. রায় সভাপতি,—সে সভায় তিনি এক মিনিটও দেরিতে আসেন না ?" এতক্ষণে যেন একটু বিশ্বাস হলো। শুনেছিলাম, আচার্য রায়ের মত সময়নিষ্ঠ পুরুষ বাঙলায় দুজন নেই। যাঁর অতি সাধারণ চেহারা দেখে বিশ্বাস করতে পারিনি যে তিনিই প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁর সময়নিষ্ঠার কথা মনে পড়তেই তিনি যে প্রফুল্লচন্দ্র, তা তো বিশ্বাস করলামই, অধিকন্তু লজ্জা এসে আমার সারা মন ছেয়ে ফেললো। আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে উঠলাম।

বক্তার পর বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চললেন, কিন্তু কারো কথা আমার কানে ঢুকলো না। আমি শুধু একদৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ পলিত-কেশ ভঙ্গুরদেহ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দিকে চেয়ে রইলাম। একের পর এক কত কথাই না মনে পড়তে লাগলো। এঁর আশ্চর্য জীবন-কাহিনী পড়ে যে মুর্তি মনে মনে মনে গড়ে তুলেছিলাম, তা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খেলো না বটে, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা আরও শতগুণ বেড়ে উঠলো। এই ভঙ্গুরদেহ নিয়ে কি করে তিনি অসাধ্য সাধন করলেন ? মনে পড়লো বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলবার জন্যে তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্য দেশের সমকক্ষ করবার সাধনা, বাঙালী ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে, অন্নহীন বাঙালীর মুখে অন্ন তুলে ধরবার জন্যে একক সংগ্রাম। মনে মনে যুক্তকরে আচার্যদেবের উদ্দেশে নমস্কার করলাম।

সকলের শেষে আচার্যদেব দাঁড়ালেন। সভাস্থলে অবিরাম হাততালি পড়তে লাগলো। আর যায় কোথা ! হাত নেড়ে নেড়ে তিনি বাঙালী জাতির অন্তঃসারশূন্যতার জন্যে তীব্র ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আশ্চর্যের বিষয়, রূঢ় গালাগালি শুনেও যেন সকলে কৃতার্থ হয়ে গেল। আচার্য রায় পরিষ্কার বাংলায় অধঃপতিত বাঙালী জাতি উদ্ধারের উপায় বর্ণনা করে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন এবং বক্তৃতার উপসংহারে বজ্রনির্ঘোষে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন,— „সকলে প্রতিজ্ঞা কর—জাতিকে বড় করিয়া তুলিবে। তোমরা

পারিবে কি? তোমাদের সাধনা দিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবে কি? সভার একদিক হতে অন্য দিকে এই একই কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

সেদিন ভাবতে ভাবতে সভা থেকে ফিরে এলাম।

বহুদিন আগে সেই যে একদিন তাঁর বাণী শুনেছিলাম, তা আজও থেকে থেকে মনে হয়—"তোমাদের সাধনা দিয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারবে কি?"

সুক্ষণে পিতমাতা নাম রেখেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র—এমন অমায়িক শিশুর মত সরলপ্রাণ ও আনন্দময় পুরুষ বাঙলায় নেই বললেই চলে। তাঁর মত একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এমন সরল ব্যবহার ও খোলা মন দেখলে কে না আশ্চর্য হয়!

যাঁরা জীবনে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের ছোটকালের ইতিহাস সাধারণত একটু বৈচিত্রময় হয়। ছেলেবেলা হতেই তাঁদের একটা কিছু বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সেই সেই ঝোঁককে যদি অনুকূল অবস্থায় চালনা করতে পারা যায়, তবে তা পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত সুফল দেয়—বিদ্যা, ধন, যশোলাভে সহায়তা করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছোটকালে একটি বিশেষ ঝোঁক ছিল—তা জ্ঞান-অর্জনের ঝোঁক। বিশেষ করে তাঁর ঝোঁক ছিল ইতিহাসের দিকে।

খুলনা জেলার, রাড়ুলি গ্রামে ১২৬৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র তাঁর পুত্রগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেও সব সময়েই নিজেকে ছাত্র বলে মনে করতেন। পিতার আদর্শ পুত্রের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আচার্যদেব সেদিনও বলেছিলেন,—"আমি এখনও নিজেকে ছাত্র মনে করি। সে জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ ক'রেছি বলে মনে হয় না। জ্ঞানের অনুশীলন আমি করে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চলে

গেছে, বুঝ্তে পারিনি ; আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়েও আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে ছ'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তক সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দিই—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষ হবার প্রেরণা দেয়, সবই পুস্তকে নিহিত।"

কিশোর প্রফুল্লচন্দ্রের মনের 'ঝোঁক' পিতার সুশিক্ষার গুণে সুনিয়ন্ত্রিত হয় ; পরবর্তী জীবনে এটি আচার্য রায়ের সাফল্যলাভের একটি কারণ। তিনি এতদূর জ্ঞানপিপাসু হয়ে উঠলেন যে, অতিরিক্ত পাঠে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। কিশোর বয়সে সেই যে স্বাস্থ্য নষ্ট হলো, তা জীবনে কোন দিনই উদ্ধার হলো না। কিন্তু তাতেও তিনি নিরাশ হন নি—অসুখের সময়ও তিনি জ্ঞানলাভে নিশ্চেষ্ট হতেন না।

আচার্যদেবের জীবনে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তাঁর বরাবরই ইচ্ছে ছিল, তিনি ঐতিহাসিক হবেন। কিন্তু শেষে একদিন ভাবলেন—'আমি বিদ্যাসমুদ্রের শেষ সীমায় যাচ্ছি ; আর আমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানব না ?" তখন তাঁর মনে বৈজ্ঞানিক হবার আকাঙ্ক্ষা জন্মালো। জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন,—"I am a chemist by mistake—আমি ভুল করে রাসায়নিক হয়েছি।" কিন্তু বৈজ্ঞানিক হয়েও তিনি ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ হারালেন না। হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন। এর নাম History of Hindu Chemistry—এই একখানা বই-ই তাঁকে ঐতিহাসিক হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি বিলেতের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি (ডি.এস-সি.) লাভ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তাঁর সমসাময়িক আরও একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঐ কলেজেই অধ্যাপনা করতেন, তিনি আর কেউই নয়—জগদীশচন্দ্র বসু। এই দুই বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুই জনেরই এক সাধনা—বাঙালীকে বিশ্বের গুণিসভায় আসন দিতে হবে।

তাঁদের সেই সাধনা আজ সার্থক হয়েছে, বাঙালী আজ জগৎ-সভায় আসন লাভ করেছে। আচার্যদেব তাঁর ঐকান্তিক সাধনার বলে ভারতবর্ষে একদল প্রথম শ্রেণীর রাসায়নিক সৃষ্টি করেছেন--যাঁদের সাধারণতঃ বলা হয় School of Bengali Chemists—বঙ্গীয় রাসায়নিক-মণ্ডলী। তাঁরা ভারতবর্ষের সকল জায়গায় ছড়িয়ে আছেন এবং বহু নবীন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করে চলেছেন। ভারতবর্ষে আচার্যদেবের সকলের চেয়ে বড় দান—এই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সৃষ্টি।

বিজ্ঞান-সাধনার জন্য তিনি ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী, কিন্তু তিনি রহস্য করে মাঝে মাঝে বলতেন—"বিশ্ববিদ্যালয় আমার পত্নী আর ছাত্রেরা আমার পুত্র।" সত্যি সত্যিই তিনি ছাত্রদের নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন। তাদের জন্যেই তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আর ছাত্রসমাজও তাঁকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিদায় নেবার সময় অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"তোমরা জান যে, আমি কখনও জাগতিক ধনসম্পত্তি খুব সাবধানে ব্যবহার করিনি।...যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে এতদিন চাকরির পর আমি কী ধনদৌলত সঞ্চয় ক'রেছি—তা'হলে আমি ইতিহাসের কর্ণেলিয়ার (Cornelia) ভাষায় জবাব দেব। তোমরা নিশ্চয়ই কর্ণেলিয়ার গল্প জান। এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে গর্বের সঙ্গে তাঁর ধনদৌলত কর্ণেলিয়াকে দেখাচ্ছিলেন এবং তাঁর কি সম্পত্তি আছে দেখাতে অনুরোধ করেছিলেন। তা'তে তিনি যে পর্যন্ত না তার ছেলেরা ফিরে আসে, সে পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। যখন ছেলেরা স্কুল থেকে এল, তখন

তাদের দেখিয়ে বল্লেন—এরা-ই আমার রত্ন। আমিও কর্ণেলিয়ার মত একজন রসিকলাল দত্ত, একজন নীলরতন ধর, একজন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, একজন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়ে বলব—এরাই আমার রত্ন।"

তিনি যে শুধু ছাত্র-সম্প্রদায়কেই ভালবাসতেন তাই নয়, তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে, বিশেষ করে বাঙালী জাতিকে, প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। বাঙালী জাতির দুর্দশা, তার অর্থনৈতিক ও মানসিক অধঃপতনের চিন্তা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তাই তিনি বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালী জাতিকে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে বলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকেই আদর্শ হিসেবে বাঙালী জাতির সামনে রেখে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠান আজ ভারতবর্ষে ওষুধের সর্বপ্রধান স্বদেশী কারখানা। এ ছাড়া আরও শত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

তিনি যেমন জাতি ও দেশকে ভালবাসতেন, তেমনি এর ত্রুটি বিচ্যুতিরও তিনি অত্যন্ত কঠিনভাবে সমালোচনা করতেন। তিনি বাঙালী ছেলেদের ব্যর্থতায় দুঃখ করে বলতেন,—"এ দেশে নব্য যুবকগণ বহু অর্থ ও চশমা, চুরুট, চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় লালিত-পালিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে সহসা সংসারের কঠিন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উহারা চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেলের সেই 'অমিতব্যয়ী পুত্রের' (**Prodigal Son**) ন্যায় পিতার চরণে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

আচার্য রায় দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, বাঙালী ছেলেদের প্রতিভা আছে, মেধা আছে, কিন্তু তা সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় তার প্রকৃত ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নি। যাতে বাঙালী-প্রতিভার স্বাভাবিক

বিকাশ হয়, তার জন্যে তিনি নিজের জীবন তিল তিল করে ব্যয় করেছেন, জলদগম্ভীর স্বরে জাতিকে আহ্বান করে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন—"আজ আমরা কালবারিধি-তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গ গুনিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব?" আবার পরক্ষণেই সবাইকে সাহস দিয়ে বলছেন,—"কঠিন সমস্যাসকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে—আমাদের কি দুর্বলচিত্ত, চাকরীপ্রিয় বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে। অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসায় ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।"

ত্যাগীশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে যে ১৬ই জুন তারিখটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, ১৯৪৪ সালের সেই পুণ্য-পবিত্র দিনে ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আর্তবন্ধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। নিমতলা মহাশ্মশানে বিশ্বকবির চিতাপার্শ্বে আচার্যদেবের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়েছে। বাঙালী তথা ভারতবাসী যুগযুগ ধরে এই মহাপুরুষকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে গৌরব বোধ করবে।

মধুসূদন দত্ত

বাণীসাধক বাঙালী



যশোর জেলার মধ্য দিয়ে কপোতাক্ষ নদী বয়ে চলেছে—তারই তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রাম। বাণী সাধনার পীঠস্থানরূপে সাগরদাঁড়ি বাঙালীর চিত্তলোক জুড়ে রয়েছে। এই গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ (ইংরেজী ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী) মধুসূদনের জন্ম। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার সদর দেওয়ানীর একজন খ্যাতনামা উকিল এবং মাতা জাহ্নবী দেবী অশেষ গুণের অধিকারিণী।

অর্থের প্রাচুর্য পারিবারিক আবহাওয়াকে মিলন-চর্চার অনুকূল করে তুলেছিল--সংযম শিক্ষার কোন অবকাশ সেখানে ছিল না। সেই জন্য মধুসূদন ছেলেবেলায় এ সংযম শিক্ষার কোন সুযোগ পান নি।

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অসীম অনুরাগ। শিশুকাল থেকেই তিনি কল্পনাপ্রিয় ছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র কাহিনী তাঁর শিল্পচিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অসাধারণ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করলেন। ১৮৩৭ সালে রাজনারায়ণ মধুকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিলেন। স্কুল ও কলেজেই তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কলেজে অধ্যয়ন কালেই মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়। অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক সাময়িক পত্রে তাঁর অনেক কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল।

একদিকে কবি-প্রতিভার উন্মেষ, অপরদিকে সাহেব হবার প্রবল ঝোঁক্ তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। পিতামাতা তাঁর অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে এর একমাত্র প্রতিকারস্বরূপ সর্বসুলক্ষণা এক সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন।

বাড়ী থেকে বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে শুনে মধুসূদন মাতাকে অসম্মতিজ্ঞাপক পত্র লেখেন, কিন্তু তাতে পিতামাতা মত পরিবর্তন না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হন। তিনি খৃষ্টান ধর্মযাজক পাদ্রীদের কথায় ও লোভ-প্রদর্শনে স্থির থাকতে না পেরে ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামান্তর ঘটল, —তিনি শ্রীহীন হলেন। তখন থেকে তিনি হলেন 'মাইকেল মধুসূদন'।

স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খল ও সংযমের অভাবে এতবড় বিরাট প্রতিভার যে শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল তার সূত্রপাত এখানেই। ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা তাঁকে পরিত্যাগ করলেন—হিন্দু কলেজে তাঁর আর পড়াশুনা হল না—তিনি বিশপ কলেজে ভর্তি হয়ে সাহেবদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

পড়া শেষ হবার পর দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হল। একদিকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেছে,

অন্যদিকে যারা তাঁকে নানাপ্রকার লোভ দেখিয়েছিল, সে সব সাহেবরাও এখন আর কাছে ঘেঁসে না।

অন্য কোন উপায় না দেখে তিনি তার পাঠ্য পুস্তকগুলো বিক্রি করে মাদ্রাজ চলে গেলেন। মাদ্রাজে গিয়ে তিনি সাহেবদের 'অরফ্যান স্কুলে' শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এতে তাঁর আর্থিক সমস্যার সমাধান হল, তিনি কাব্য-লক্ষ্মীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

কতকটা অভাব ও কতকটা আজীবন কাব্য চর্চার ঝোঁকে তিনি মাদ্রাজের বড় বড় কাগজে লিখতে স্বুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। সেই সময় তিনি রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস নামে একজন স্কচ মহিলার পাণি গ্রহণ করেন।

ধীরে ধীরে তাঁর লেখার আদর হতে লাগল। বাঙালী যুবকের ইংরেজী ভাষায় আশ্চর্য দখল দেখে অনেক বিখ্যাত ইংরেজ লেখক পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চারদিকে তার সুখ্যাতি রটে গেল। অচিরেই কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। এর কিছুকাল পরে তিনি 'ক্যাপটিভ লেডী' নামে একটি ইংরেজী কাব্য লিখলেন। কাব্যের সুখ্যাতি রটলেও টাকার অঙ্ক মোটেই আশানুরূপ হল না। তিনি তারপর মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে বেশী মাইনের চাকুরী পান এবং মাদ্রাজের 'স্পেকটেটর' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন। কিন্তু অভাব আর কিছুতেই যায় না। তারপর তিনি হেনরিয়েটা নামে একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন।

মহামতি বেথুন সাহেব তাঁর 'ক্যাপটিভ লেডী' পড়ে বলেন যে কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট হলেও তিনি তাতে যথেষ্ট অর্থ ও সুনাম পাবেন না, মাতৃভাষায় বই লিখতে পারলে তার কবি-প্রতিষ্ঠা উচ্চস্থান লাভ করবে। এই মন্তব্যে মধুসূদনের মতি পরিবর্তিত হল। তিনি তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা, সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও একনিষ্ঠ সাধনা বঙ্গ ভারতীর সেবায় নিয়োগ করলেন।

মাদ্রাজে যাবার তিন বছর পর তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৬

সালের জানুয়ারী মাসে আট বছর মাদ্রাজে বাস করবার পর মধুসূদন আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় এসে অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাকের চেষ্টায় তিনি পুলিশ আদালতে একটা কেরাণীর চাকরী পেলেন, অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার দোভাষীর পদে নিযুক্ত হলেন।

সে সময় কলকাতায় বাঁধা থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালি প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় বেলগাছিয়াতে রাজাদের বাগানে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে প্রথমে অভিনীত হয় সংস্কৃত নাটক —'রত্নাবলী'। সংস্কৃতানভিজ্ঞ দর্শকদের যাতে এই নাটকের রস গ্রহণে অসুবিধে না হয়, সে জন্য স্থির হল যে নাটকটির একটি ইংরেজী অনুবাদ দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। গৌরদাস বাবু সেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তাঁর চেষ্টায় মধুসূদন 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদের ভার পেলেন।

এর পর উক্ত রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়। দৃশ্যপটের অভিনব সংস্থান, সংলাপের লালিত্য প্রভৃতিতে তা এক নূতন আলোকের সন্ধান দান করে। তারপর তিনি 'পদ্মাবতী' নাটক লেখেন। বাংলায় তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল না। ইংরেজী কাব্যে সুপণ্ডিত মধুসূদনের ধারণা ছিল, যতদিন বাংলা কাব্যে বন্ধনমুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না হবে, ততদিন পর্যন্ত তার উন্নতি সম্ভব নয়। ১৮৬০ সালে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য লিখে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। এই সকল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অর্থাগম হতে লাগল। ১৮৬১ সালে তিনি মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য' লিখলেন। এই কাব্য লিখেই তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। চার পাঁচ বছর পূর্বে যিনি শুদ্ধ করে বাঙলা চিঠি লিখতে পারতেন না, তিনিই হলেন বাঙলার মহাকবি —মধুসূদন দত্ত।

তারপর ব্যারিষ্টারী পড়বার আশায় তিনি বিলেত যাবার সঙ্কল্প করেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির আয় থেকে তাঁর বিলেতের খরচ ও পত্নীপুত্রের ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করে ১৮৬২ সালের ৯ই জুন তিনি বিলেত যাত্রা করেন।

বিলেতে গিয়ে মধুসূদন মহাবিপদে পড়লেন। যাঁর জিম্মায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা পাঠালেন না, এদিকে মধুসূদনের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য যে টাকা দেবার কথা ছিল, তাও দিলেন না। উপায়ান্তর না দেখে দুটি শিশু সন্তানসহ মধুসূদনের পত্নীও স্বামীর কাছে বিলেতে চলে গেলেন।

মধুসূদন চারদিক অন্ধকার দেখলেন। অগত্যা তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লিখলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁকে ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং পরে আরও টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বিদ্যাসাগরের দয়াতেই মধুসূদন সর্বনাশের দায় থেকে বেঁচে গেলেন। তারপর পাঁচ বছর বিলেতে থেকে তিনি ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ন প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা শিখলেন। শেষে ব্যারিষ্টার হয়ে ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে দেশে ফিরে এলেন।

ভাবালুতা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণ আইনের ব্যবসায়ে তাঁর উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিল। ব্যারিষ্টারীতে আয় বেশী হয় না দেখে তিনি দিনকতক আবার চাকুরী করলেন। কিন্তু আয় থেকে ব্যয় বেশী বলে দেনা বেড়েই চলল। অতিকষ্টে, অতিদুঃখে নূতন নূতন ধার করে মধুসূদনের দিন কাটতে লাগল।

জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে মধুসূদন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠার বিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ দশায় তিনি আর তাঁর স্ত্রী দুজনই যখন বিষম রোগে দিন দিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন তার বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে তাঁর স্ত্রীকে মেয়ের কাছে রেখে তাঁকে আলিপুরের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

হেনরিয়েটার অসুখ দিনের পর দিন বেড়েই চলল—মধুসূদনও

হাসপাতালে শয্যাশায়ী। গভীর পরিতাপের বিষয়, শেষ অবস্থায় এঁরা একে অন্যকে দেখতে পেলেন না। হেনরিয়েটার মৃত্যু হল। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বন্ধুরা তাঁর যথারীতি সমাধির ব্যবস্থা করে মধুসূদনকে দেখতে গেলেন।

মধুসূদনের তখন অন্তিম অবস্থা। তিনি কাঁদতে কাঁদতে মনোমোহনের হাতে হাত দিলেন। হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিন দিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন রবিবার বেলা দু'টার সময় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও সকল দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে মহাপ্রয়াণ করলেন।

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পঁদে,
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন কর' না গো তব মন কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে!
কিন্তু যদি রাখ মনে নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না কো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

মুক্তি-যুদ্ধের বীর সেনানী



১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী।

কংগ্রেস-ঘোষিত পুণ্য-পবিত্র স্বাধীনতা দিবস। ভারতের আকাশে সেদিন বুঝিবা দ্বাদশ সূর্যের উদয়। তাই বড় উজ্জ্বল, বড় মহিমময় ভারতের পূর্ব দিগন্ত। প্রভাতসূর্য নতুন করে ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দিয়েছে। ভারতের সর্বত্র কত শত নরনারী সেদিন আর একবার নতুন করে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করবে। দিকে দিকে সেদিন উৎসাহ উদ্দীপনা, আশার নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ভারতবাসীর হৃদয়।

এর মধ্যে অকস্মাৎ শোনা গেল,—সুভাষচন্দ্র তাঁর গৃহ থেকে রহস্যজনকভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু এ সম্ভব হয় কিরূপে? অন্তর্হিত হবার অল্প কয়েকদিন আগে তাঁকে কারামুক্ত করে স্বগৃহে আটক রাখা হয়েছিল ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ার দরুণ। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দারা তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীর চারদিকে কড়া পাহারায় ছিল। তাদের সতর্ক দৃষ্টিকে এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র কোথায় যেতে পারেন? অতগুলি সতর্ক গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হয়েছেন, এ যে কল্পনাতীত! তাই গোয়েন্দারা সুভাষচন্দ্রের বাড়ীর ভিতরে বাইরে সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। শেষে সারা কলকাতার পুলিশ, এমন কি—সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠলো। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কোন সন্ধান তাদের সন্ধানী দৃষ্টি পেলো না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বার্লিন রেডিও থেকে শোনা গেল— "বিগত দুইশত বৎসরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি,—বিশেষতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু কোথাও বৈদেশিক সাহায্য না লইয়া কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তও আমি পাই নাই। এমন কি বৃটেনও তাহার নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজ শুধু যে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে এমন নয়, পরন্তু ভারতের মত পরাধীন দেশের সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ সাহায্য ভিক্ষায় যদি বৃটেনের কোন দোষ না থাকে, তবে ভারতের পক্ষে তাহার স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করায় কোন দোষ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা সর্বপ্রকার সাহায্যই সাদরে গ্রহণ করিব।"—এই ঘোষণা কার, সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর না? দেশবাসী কৌতুহলী হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র কোথায় গেলেন একথা চিন্তা করে। ইংরেজ সরকার, পুলিশ গোয়েন্দারাওতু কৌহলী

ছিল। এই ঘোষণার পর সকলেই জানলেন চিরবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে দেশ ত্যাগ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশের শত্রু জার্মানীর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। বোঝা গেল যে, ভারতীয়দের নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি এমন অংশ গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর যাতে ঐ যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ ইংরেজের বন্ধন-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা অযৌক্তিক বলে মনে করেননি। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য বিদেশী শক্তির সহায়তা গ্রহণের নজির ইতিহাসে অসংখ্যই রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে যদি মৈত্রী চুক্তি সম্ভব হতে পারে, তবে স্বাধীনতা-কামী ভারতবর্ষ ইংরেজের শত্রুর পক্ষে যোগ দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তাতে দোষ কোথায় ?

বার্লিনে হিটলারের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র আধুনিক রণবিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পেলেন এবং স্বয়ং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সংগ্রাম পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র জার্মানী ও অষ্ট্রীয়ায় আটক ভারতীয় এবং জার্মান বাহিনীর হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করলেন। প্রায় আটাশ হাজার ভারতীয় এই বাহিনীতে যোগ দেয় এবং জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত শক্তির বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে। জার্মানীর মত ইতালীতেও সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় আর একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতালীয় সেনা-নায়কদের মতান্তর হওয়ায় কিছুকাল পরে ভারতীয় সেনানায়কগণ ইতালীয় ফৌজ ভেঙে দেন। এর পরে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বীরবিপ্লবী রাসবিহারী ও অন্যান্য প্রবাসী ভারতীয়দের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র টোকিও চলে যান।

ভারতীয় নেতৃবর্গ ও ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বার বার আহ্বান জানাতে থাকেন ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লব সুরু হলে তিনি ভারতীয় জনগণকে অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে কখনও আপোষ হতে পারে না, সুভাষচন্দ্র একথা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন। অন্যায়ের ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কল্যাণ-ব্রত তিনি গ্রহণ করেন কিশোর বয়সে এবং তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। ছোটবেলা থেকেই জাতীয় অপমানকে তিনি ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর কলেজ-জীবনের একটি ঘটনাতেই প্রথম প্রকাশ পায় বিদ্রোহী ভারত একদিন এই সুভাষচন্দ্রকেই 'নেতাজী' হিসেবে বরণ করে নেবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করতে সেই দিনের সেই ঘটনাটিও মনে পড়ে। ঘটনাটি এই

এত হট্টগোল কিসের ?

সেরা সরকারী কলেজ। মেশিনের মত সুশৃঙ্খলভাবে সব মানুষ যেখানে চলাফেরা ও কাজকর্ম করে সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সকলের সমবেত হৈ-চৈ, এদিক-ওদিক ছুটাছুটি! কি ব্যাপার ? কলেজের সামনে আবার একদল পুলিশও এসে দাঁড়িয়েছে, নিশ্চয়ই বড় রকমের একটি কোন ঘটনা ঘটে থাকবে !

রাজপথে জনতার ভীড়। এ ওকে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে ; কিন্তু কেউই কাউকে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারে না। ইতিমধ্যে একটি ছাত্র বেরিয়ে আসে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে। চোখে মুখে তার তীব্র উত্তেজনার ভাব। রাস্তায় নেমে আসতেই জনতা তাকে ঘিরে ধরে। চারদিক থেকে একই প্রশ্ন, "কিসের গোলমাল ?"

অল্প কয়েকটি কথায় ছাত্রটি উত্তর দেয়, "ওটেন সাহেব বাঙালী ছাত্রদের এবং সমগ্র বাঙালীকে উদ্দেশ্য করে অপমানকর কথা

বলেছিলেন, আমরা সমুচিত জবাব দিয়েছি। সুভাষ শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপককে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তরুণ বাঙলা আজ জাগ্রত, বাঙলার যুবক নীরবে আর বিদেশীর কাছে বাঙালীর অথবা কোন ভারতীয়ের অপমান সহ্য করবে না।"

এই ক'টি কথা বলেই ছাত্রটি দ্রুতপদে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। জনতার আগ্রহও অনেকটা প্রশমিত হয় তার উত্তরে। বাঙালীর অপমানের যে সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে, এটা জেনে সকলেই খুশী। ছাত্রমহলেও কিন্তু এই ঘটনায় বেশ একটু বিস্ময়েরও সৃষ্টি হয়েছিল। তার কারণ প্রধানতঃ এই যে, সুভাষচন্দ্র শিক্ষকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁর বিনীত ও সুমধুর ব্যবহারে অধ্যাপকবর্গ সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। কাজেই তাঁর নেতৃত্বে অধ্যাপক ওটেন সাহেব সমুচিত শিক্ষা পাবেন, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

এই ঘটনার পরে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় এবং তাঁর শিক্ষালাভের পথে কিছু ব্যাঘাতও ঘটে। সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমরা এই দৃষ্টান্তেরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে তিনি তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বিপদ্-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার প্রশ্ন মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মনে আসে নি।

কলকাতায় এম. এ. পড়বার সময় পিতা জানকীনাথের পীড়াপীড়িতে আই. সি. এস. হবার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে বিলেতে যেতে হয়। কিন্তু হাকিম হয়ে বিদেশী শাসনকে কায়েম রাখবার জন্যে যিনি নির্দিষ্ট নন তাঁর কাছে আই. সি. এস.-এর ঔজ্জ্বল্য সম্মানের নয়, বিড়ম্বনা মাত্র। পিতৃ-আজ্ঞায় তিনি মাত্র আট মাসের চেষ্টায় আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় মুহূর্তের জন্যও চিন্তা না করে সুভাষচন্দ্র অতি লোভনীয় আই. সি.

এস. পদে ইস্তফা দিলেন পরিপূর্ণভাবে দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম-নিয়োগের উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্কল্প নিয়েই তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে এসে প্রথমেই সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরই উপদেশ অনুসারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন থেকে বারংবার কারাবরণে, নির্বাসনে ও অন্যান্য বহুবিধ সরকারী নির্যাতনে সুভাষচন্দ্রকে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কিন্তু শত লাঞ্ছনা তাঁকে দেশসেবার পবিত্র আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। উত্তর বঙ্গের বন্যার্তদের ত্রাণকার্যে, স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা' পরিচালনায়, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও পরে মেয়র রূপে এবং সামরিক শৃঙ্খলাপরায়ণ বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রতিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র যে সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দেন, তাই ছিল বৃটিশ সরকারের বিশেষ উদ্বেগের কারণ। স্বাস্থ্যোদ্ধারে ইউরোপে গিয়ে তিনি সেখানে স্বাধীনতাকামী ভারতের হয়ে যে প্রচারকার্য করেন, সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তাতে ভারতের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বিদেশে জাতীয় কংগ্রেসের বাণী প্রচারের আবশ্যকতার উপর তিনিই প্রথম জোর দেন।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ও পরাধীন জাতির মধ্যে কোনরূপ আপোষ চলতে পারে না। এ সময়ে সমগ্র ভারতের হৃদয়-রাজ্যে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাই এর পরের বছরেও তিনি পুনরায় কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হন। মহাত্মা গান্ধী ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের পূর্ণ সমর্থন সত্ত্বেও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু ভোটে পরাজিত হন। কিন্তু নেহেরু-প্যাটেল প্রমুখ

নেতৃবর্গের সহযোগিতা না পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সভাপতির পদ শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করে কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসেন এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকায় লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধের জন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয় এবং তাঁর দেশত্যাগী হবার দীর্ঘকাল পরেও আদালতে এই মামলার শুনানী চলে।

জাতীয় নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের বহু কাজই মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তার মধ্যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন, কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশে ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর জীবনে আর একটি স্বপ্ন-সাধ ছিল। সমস্ত নির্যাতিত দেশকর্মীর আশ্রয়স্থলরূপে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন 'মহাজাতি সদনে'র। ১৩৪৬ সালের ২রা ভাদ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এই মহৎ প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা বীরত্বপূর্ণ ও মহত্তম অধ্যায় সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠায় এবং তাঁর অধীনে সুসংবদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বৃটিশ শক্তির উচ্ছেদকল্পে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায়। সুভাষচন্দ্রের অসামান্য ব্যক্তিত্বে ও গভীর আন্তরিকতায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সর্বজাতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, শিখ সকল লোকই ছিল তাঁর সেনাবাহিনীতে। কিন্তু এমনি ভাবে তিনি সকলের মন থেকে বড়ছোটর গণ্ডি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে

সকলকে আবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, কে কোন জাতির লোক বা কে ছোট কে বড় তা কখনও কারো মনেই আসতো না।

নেতাজীর নামে শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতবাসী কেন, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেও তাঁর মধ্যে কোন নেতৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। সিঙ্গাপুরে এক দিন তাঁর জন্য খাবারের একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিলেনঃ "সৈন্যরা যে খাবার খাবে আমিও তাই খাব। তাঁদের সঙ্গে আমায় কখনো আলাদা করে দেখো না। তাঁরাও যা, আমিও তাই।" আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ ঘটনার অভাব নেই। হাসপাতালে গিয়ে প্রত্যহ আহত সৈনিকদের দেখে আসা ছিল তাঁর নিয়মিত কাজের মধ্যে অন্যতম। সেখানে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি রুগীর খোঁজ খবর নিতেন। একদিন তাঁর চোখে পড়ল, একটি আহত সৈন্য শীতে কাঁপছে, অথচ তার গায়ে সামান্য একটা গেঞ্জি ছাড়া আর কিছুই নেই। নেতাজী তাঁর নিজের গায়ের মূল্যবান কোটটি খুলে নিয়ে নিজ হাতে ঐ সৈনিককে পরিয়ে দিলেন। দেশের মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্রের অঙ্গুলি হেলনে লক্ষ লক্ষ লোক যে কেন আত্মদানের ব্রত নিয়েছিল, এই সব দৃষ্টান্ত থেকেই তার সন্ধান মেলে। নেতাজীর নির্দেশে আজাদী সৈন্যরা শত্রুবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে যেদিন ভারতভূমিতে পদার্পণ করে সমবেত কণ্ঠে দেশমাতার বন্দনা করলো এবং মণিপুরের মাটিতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উড্ডীন করলো তখন কোন ভারতবাসী না তার অন্তরে বিদ্যুত-শিহরণ অনুভব করেছে? রসদ ও সমরোপকরণের অভাবে এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ আজাদী বাহিনী সে সময় চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি তার মূলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ

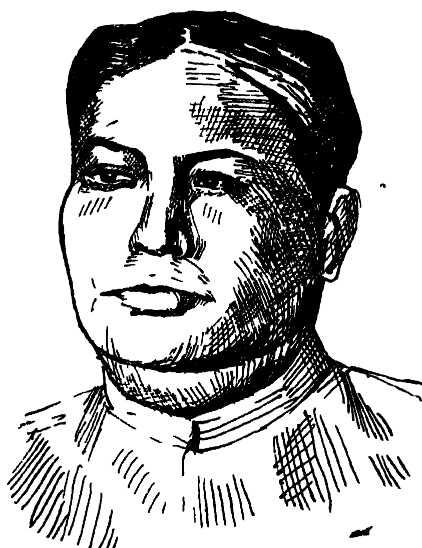
হিন্দ বাহিনীর দানকে ছোট করে দেখবার উপায় নেই।

ইম্ফলে এবং পরে ব্রহ্মযুদ্ধে ভাগ্য বিপর্যয়ের পর নেতাজী ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুণ ত্যাগ করে ব্যাঙ্ককে তাঁর প্রধান হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন। কিছুকাল পর ২৩শে আগষ্ট হঠাৎ এক সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ১৮ই আগষ্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী প্রাণত্যাগ করেছেন! এই দুঃসংবাদ ভারতবাসী স্তব্ধ-বিস্ময়ে শুনেছে মাত্র, বিশ্বাস করে নি।

বীরের মৃত্যু নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র অমর। তাঁর 'জয় হিন্দ্' মন্ত্র অবিনশ্বর। সমগ্র ভারত আজ একান্তমনে এই প্রার্থনাই করে—

"তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো।"

ফজলুল হক
বাঙলার শের



বেয়ারা এসে সেলাম করে সামনে দাঁড়াল। সবিনয়ে মাথা নুইয়ে একখানি ভিজিটিং কার্ড হাতে তুলে দিল কর্তার। তারপব আদাব জানিয়ে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু একি ব্যাপার, সাহেব যে ভিজিটিং কার্ডে একবার চোখ বুলিয়েই ইজি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন! তারপর কোমরে লুঙিটা কষে বেঁধে নিয়ে কোনো রকমে চটি জোড়া পায়ে গলিয়েই ফতুয়া গায়ে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন!

ঘরের সবাই অবাক। সকলেরই ধারণা, লাট সাহেব নিশ্চয়ই ডেকে পাঠিয়ে থাকবেন তাঁর নতুন প্রধান মন্ত্রীকে।

তা' হলে কি সাহেব এরকম প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় কব্জিতে একগাদা তাবিজ কবজ ঝুলিয়ে নিয়ে লাটের দূতকে এগিয়ে আনতে ছুটে যেতেন ?

এই প্রশ্নকর্তার অনুমানই যে ঠিক একটু পরেই তা বুঝতে পারা গেল। সাহেবের কণ্ঠস্বর ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। তিনি বেশ কড়া ভাষাতেই তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠজনকে কথা শোনাতে ওপরে উঠে আসছিলেন। তিনি বলছিলেন, তুই কার্ড দিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলি, তোর একটু লজ্জাও হলো না।

অভিমান-ক্ষুব্ধ এই প্রশ্নে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন সঙ্গের ভদ্রলোক। থতমত খেয়ে তবু কোনোরকমে একটা উত্তর দিলেন তিনি, বললেন, কি জানি ভাই কোথায় আবার বে-আদবি হয়ে যায়, তুই যে এখন প্রিমিয়ার ভাই !

আবাল্য হিন্দু বন্ধু ঐ জেলা জজের সে কথায় দপ করে যেন জ্বলে উঠলেন অখণ্ড বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। হলঘরে পা ফেলতে ফেলতে বললেন, বে-আদবি ! কেন, আমরা এক মায়ের দুধ খাইনি ?

হলঘরটা কেঁপে উঠলো। দুই বন্ধু আলাপে বসলেন।

এমনি দুর্লভ অন্তরের মানুষ ফজলুল হক।

ইতিহাসে যে ক'জন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের মানুষ বলে বর্ণিত হয়েছেন, 'শের-ই বাঙ্গাল' আবুল কাশেম ফজলুল হক তাঁদের অন্যতম।

পতন-অভ্যুত্থান, জয়-পরাজয় ও সাফল্য-বিপর্যয়ে ভরা দীর্ঘ জীবন। কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, আবার তার বিরোধিতাও করেছেন ; যে হাতে মুস্লিম লীগ গঠন করেছেন, সে হাতেই ভাসিয়ে দিয়েছেন তাকে বুড়িগঙ্গার জলে ; একদা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালেই বলেছেন, দেশ বিভাগে কারও কল্যাণ হয়নি। ১৯১৬-২১ সালে যখন তিনি মুস্লিম লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিলের একটানা সভাপতি, সেই পাঁচ বছরের মধ্যেই ১৯১৮ সালে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি

ও ১৯২০ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন অসম্ভব ঘটনা শুধু ফজলুল হককে কেন্দ্র করেই সম্ভব হতে পেরেছে।

সমুদ্রকে দূর থেকে দেখলে শুধু তার অশান্ত রূপটাই চোখে পড়ে। কাছে এলে তবেই দেখা যায়, পারস্পরিক সংঘাতে ফেটে পড়া বড় বড় ঢেউগুলির নীচে ধীর প্রবাহিনী প্রশান্ত জলরাশি। সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয়ের মানুষ জনাব ফজলুলের শান্ত সমাহিত রূপটিও তেমনি দেখতে পাওয়া যেত তার কাছে গেলে। আর বোঝা যেত কেন ঐ শান্ত সাগরের বুকে ক্ষোভ ও বেদনার অভিব্যক্তি অহর্নিশি হয়ে উঠত ঝড় তুফান।

আপাত দৃষ্টিতে যত পরস্পর-বিরোধিতাই জনাব ফজলুলের জীবনে দেখা যাক একটি বিষয়ে ঐ দীর্ঘজীবি মানুষটিকে তাঁর প্রায় ছয় দশকের রাজনৈতিক জীবনে কোন আপোস করতে দেখা যায় নি ; এবং তা হলো বাঙলার নগর ও পল্লীর শ্রম ও কৃষিজীবি মানুষের স্বার্থ। সেখানে তিনি জীবন ভোর অনড়, অপরিবর্তনীয়, আপোসহীন। আরও ঠিক মতো বলতে গেলে ঐ খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে জনাব ফজলুলের রাজনৈতিক জীবন। প্রভাবশালী জমিদার সদস্যদের চাপে পড়ে কংগ্রেস যখন ভূমি-সংস্কারে নিরুদ্যম, জনাব ফজলুল তখন কৃষক প্রজা পার্টির ; অবাঙালী-প্রভাবিত মুস্লিম লীগ যখন বাঙালী মেহনতকারী মানুষের প্রতি বিমুখ, শের-ই-বাঙ্গাল তখন মুস্লিম লীগের পয়লা নম্বর শত্রু।

তাই ঠিকমতো বলতে গেলে ফজলুল হক চিরদিন একটি দলেই ছিলেন, সে দল হলো শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত, খেটে-খাওয়া মানুষের দল। তাদের স্বার্থ যখন যে দেখেছে, তাদের কথা যখন যে দল বলেছে তখনই তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন জনাব ফজলুল। যখনই তার ব্যতিক্রম দেখেছেন, তখনই দূরে সরে এসেছেন তাদের

কাছ থেকে। তাই যাদের রাজনীতির খোঁজখবর শুধু খবরের কাগজে বা পুথিপত্রে সীমিত, তাদের বিচারে ফজলুল হক বারবার দলত্যাগী, ফজলুল হক অস্থির, অনিশ্চিত, নির্ভরের অযোগ্য। কিন্তু তিনি লোক ছিলেন যাদের, বাঙলার সেই গ্রাম-গঞ্জের মানুষ কোনদিন তাঁকে চিনতে বা বুঝতে ভুল করেনি। তারা যে অর্ধ শতাব্দীকাল জেনে রেখেছিল, হক সাহেব তাদের লোক, সে জানা কখনও মিথ্যা প্রমাণ হয়নি। বারে বারে '৩৭, '৪৬, '৫৪-য় হক সাহেবের আহ্বানে বাঙলার মানুষ এক ডাকে সাড়া দিয়ে তা প্রমাণ করেছে।

১৮৭৩ সালে বরিশালের চাখার গ্রামে ফজলুল হকের জন্ম। বাবা মৌলভি মহম্মদ ওয়াজেদ ছিলেন সরকারী উকিল। মুসলমান প্রধান চাখার গ্রামে ঐ পরিবারটিই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। সে কারণে হক সাহেবের শৈশব শিক্ষাও উপেক্ষিত হয় নি। কিন্তু গ্রামে কোন স্কুল ছিল না, তাই তাকে পড়তে যেতে হয় পার্শ্ববর্তী হিন্দু-প্রধান খলসেখোলা গ্রামে।

ক্ষুরধারবুদ্ধি, বরাবর অঙ্কে একশ' পাওয়া ছেলে। নম্বরের মোট সংখ্যায় তার ধার-কাছেও কোন হিন্দু ছেলে আসতে পারে না। কিন্তু তবুও বালক ফজলুলের মন অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁর শিশুদিনের খেলার সাথী, চাখার গ্রামের সব মুসলমান ছেলে নিরক্ষর। কারণ তারা গরীব, তাদের লেখাপড়া শেখার কোন উপায় নেই। অথচ সুযোগ পেলে তারা কারও চেয়ে কম হতো না, সে তো তিনি নিজের সাফল্যেই বুঝতে পারছেন। হিন্দু ছেলেরাই তাঁর খেলার সাথী, বন্ধু এবং সে বন্ধুত্বে যে কোন ফাঁকি নেই, সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ ছিলেন জনাব ফজলুল। সে কারণে সুবে বাঙলার উজিরে আজম হওয়া কালেও শৈশবের বন্ধুদের হঠাৎ দেখতে পেলে প্রায় শিশুর মতোই আনন্দে বিহ্বল, দিশাহারা হয়ে পড়তেন। কিন্তু কখনও ভুলতে পারেননি শিশুমনে জাগা সেই প্রশ্নটি, কেন মানুষ হয়ে জন্মেও মানুষের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত তাঁর গ্রামের মানুষগুলি? কোন

পিতৃপুরুষের অভিশাপে তারা বংশ-পরম্পরায় ডুবে আছে অজ্ঞতার অন্ধকারে? যদি একটু স্বচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম না হতো, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিপল-অনার্স পাওয়ার প্রতিভা নিয়ে জন্মে তাঁকেও তো আজীবন নিরক্ষরতার অভিশাপে অভিশপ্ত জীবন-যাপন করতে হতো। নিজে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই বুঝেছিলেন, শিক্ষার মূল্য কি, আর সে মহামূল্য সম্পদ থেকে যারা বঞ্চিত, তারা কত হতভাগ্য। এই জন্যই বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জনাব ফজলুল যে দপ্তরটি নিজের হাতে রাখেন, সেটি হলো শিক্ষা। মানুষের দুঃখ দূর করতে হলে সবার আগে গ্রামে গ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে, এ কথা অন্তর থেকে, জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন সেই দুঃখী মানুষের বন্ধুটি, আর সেই কারণেই স্বরাষ্ট্র বা অর্থদপ্তরের চেয়ে শিক্ষা দপ্তরটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সে কারণে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে থাকা দরকার বলে মনে হয়েছিল তাঁর।

তাছাড়া ক্ষমতা বা পদমর্যাদার লোভে তো মুখ্যমন্ত্রী হন নি তিনি। তা চাইলে তো অনেক সহজে, অনেক বেশিই পেতে পারতেন তিনি। তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজের সতীর্থরা তো অনেকেই ছিলেন স্যার– স্যার এন. এন. সরকার, স্যার বি. এল. মিত্র, স্যার পি. সি. ঘোষ, স্যার মন্মথ নাথ—আরও কত রথী মহারথীরা। আর তিনি তো ছিলেন ছাত্র হিসাবে তাঁদের সবার উপরে, ১৮৯৪ সালে রসায়ণ, গণিত ও পদার্থ-বিদ্যায় ট্রিপল অনার্স পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হন তিনি। তারপর তিনি ছিলেন জাতিতে মুস্লিম, যাঁদের সেদিন ইংরেজের কাছ থেকে খাতির, খেতাব বা উচ্চ রাজপদ পাওয়ার জন্য খুব বেশি তদবিরের প্রয়োজন হত না। কিন্তু সে সব সম্মানের জন্য বিন্দুমাত্রও লালায়িত হন নি তিনি কোনদিন। এই জন্যই এম. এ. পাশ করার পর ইংরেজের ঘরের স্যার হওয়ার জন্য তিনি ছোটাছুটি না করে ছুটেছিলেন নিজের জেলায়, বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে (১৯০৩-০৪) অধ্যাপনা করতে, ছাত্রদের স্যার হতে। তখন কয়েক বছর বাংলায়

সাহিত্য চর্চাও করেন তিনি। ১৯০১-০৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'বালক' পত্রিকার সম্পাদক, তারই মধ্যে কিছুদিনের জন্য (১৯০০-৩) 'ভারত-সুহৃদ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

কিন্তু সোনার মেডেল পাওয়া হীরের টুকরো ছেলের উপর নজর সকলেরই। সুতরাং বিয়েও হল বড় ঘরে, আর সরকারি পদ গ্রহণের দাবিও বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। এম. এ. পাশ করার পরেই বিবাহ হয়েছিল নবাব সৈয়দ মহম্মদের কন্যার সঙ্গে। তারপর আইন অধ্যয়ন শেষ করে প্রথমে অধ্যাপনার সাধ মেটান, সেই সঙ্গে সাহিত্য চর্চারও। ১৯০৬ সালে হলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর পদোন্নতি ঘটতে লাগল দ্রুতগতিতে। কিন্তু সে কথা আগেই বলেছি। উচ্চ রাজপদে মুগ্ধ হয়ে থাকার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাই ১৯১২ সালে যখন তিনি বাঙলা-বিহার-আসামের এ্যাসিস্টান্ট কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রার, তখন রাজপদে ইস্তফা দিয়ে সোজা চলে এলেন কলকাতায়। শুরু হল স্যার আশুতোষের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে আইন-ব্যবসা। অনতিবিলম্বেই হয়ে উঠলেন মন্মথ মুখার্জি, দাশরথি সান্যালের সমপর্যায়ের নাম করা উকিল। মক্কেল সমাগমে, প্রায় প্রতিদিনই চঞ্চল হয়ে উঠত তাঁর গারনার ষ্ট্রীটের বাড়া। কিন্তু অস্থির অশান্ত ফজলুলের হৃদয় তাতেও শান্ত হয় না। মন পড়ে থাকে গাঁয়ে। আর কেবল ভাবেন, কি হবে টাকায় কি হবে সম্পদে, যদি দেশের মানুষের কোন কল্যাণে না লাগেন তিনি? ভগবান তাঁকে যে বিদ্যা ও বুদ্ধি দিয়েছেন, তার সবটাই যদি তিনি আত্মসেবায় নিয়োগ করেন, তাহলে ভগবানের বিচারে কি অতি স্বার্থপর প্রমাণ হবেন না তিনি? ধর্মভীরু, লোকবন্ধু ফজলুলের মনে বারবার আসে এ প্রশ্ন আর কিছুতেই তিনি শান্ত থাকতে পারেন না।

১৯১২-১৩ সালে এল মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ। ফজলুল তৎক্ষণাৎ সে নির্বাচনের সুযোগ নিলেন ও জয়ী হয়ে এলেন। একই সঙ্গে চলতে

লাগল আইন সভা ও আইন আদালতের কাজ, সেই সঙ্গে দেশের মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে, মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার আরও ব্যপক ভোটাধিকার ও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন আইন সভা, লিবারেল দলের নেতারূপে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এলেন ব্যবস্থাপক সভায় এবং মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করলেন ঐ সীমিত ক্ষমতার হস্তান্তরকে সেই অবস্থায় যথেষ্ট মনে করে। ফজলুল হক নির্বাচিত হয়ে এলেন কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলেন আরও বেশি সুযোগের প্রত্যাশায়।

তারপর ১৯২৪ সালের নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল যখন বিপুল সংখ্যায় প্রবেশ করলেন আইনসভায়, মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের অন্তঃসার শূণ্যতা প্রমাণ করতে, তখনও ফজলুল হক এলেন আইনসভায়; কিন্তু বিরোধিতা করতে নয়, শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলের প্রবল বিরোধিতার মুখে প্রথম মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন জনাব ফজলুল হক। আর বিরোধী দলের নেতা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কিন্তু দু'জনেই দেশের সুহৃদ দরিদ্রের বন্ধু। রাজনীতির ব্যবধান দুটি মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে রাখতে পারলো না। দেশবন্ধুই তাঁকে টেনে আনলেন বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের মাঝে। ঢাকার নবাবের আহ্বানে ১৯০৬ সালে মুস্লিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালে পিছিয়ে পড়া মুস্লিম সমাজের অকৃত্রিম সুহৃদ হয়েও তিনি যে জাতীয় আন্দোলনেরই অংশীদার থাকতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ দেন তিনি মুস্লিম লীগে থাকাকালেই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে। আর তিনি প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী বলেই মুস্লিম লীগেব পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের সঙ্গে কখনও তাঁর মনের মিল হয় নি। মুস্লিম লীগ কখনও তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেনি। এবং জনাব ফজলুল হকও কখনো মুস্লিম লীগ নেতাদের আমল দেন নি। মুস্লিম লীগের কাছে কংগ্রেস হার মেনেছে। কিন্তু মুস্লিম লীগ বারবার ধরাশায়ী হয়েছে ফজলুল

হকের প্রচণ্ড আঘাতে। সে লড়াইয়ের সূচনা ১৯৩৭ সালে, পরিসমাপ্তি ১৯৫৪ সালে। প্রতিবারই শের-ই বাঙ্গাল ফজলুল হক বিজয়ী বীর, প্রতিবারই মুস্লিম লীগ পর্যুদস্ত, ক্ষত-বিক্ষত। পটুয়াখালিতে যার সূচনা, বুড়িগঙ্গার জলে মুস্লিম লীগের বিসর্জনে তার বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি। '৩৭ সালে নির্বাচনের পর মুস্লিম লীগের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন কংগ্রেসের কাছে থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর, কিন্তু তার জন্য নীতির প্রশ্নে মুস্লিম লীগের সঙ্গে কোন আপস তিনি করেননি। তাই মুস্লিম লীগের চাপ বাড়তেই বিদ্রোহী হয়েছেন তিনি আবার চলে এসেছেন জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির কাছে। সাম্প্রদায়িকতার ছুরিকাঘাতে ভারত বিভাগ যখন অনিবার্য হয়েছে, তখন তাকে নিরুপায়ের মতো মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে যখন পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ এসেছে, তখনই পূর্ববঙ্গে মুস্লিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করে এবং সেখানকার প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, দেশ বিভাগে কারও কল্যাণ হয় নি।

হৃদয়ের আবেদনই ছিল হক সাহেবের কাছে সবচেয়ে বড় হক কথা, তার জন্য উচ্চ রাষ্ট্রীয় মহলের আদব-কায়দা তুচ্ছ ছিল তাঁর কাছে। এই জন্যই রাজ্যের উজিরে আজম যখন তিনি, তখনও ঝাউতলা রোডের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে থাকতেন লুঙ্গি পরে, খালিগায়, সকলের সঙ্গে কথা বলতেন পুরো বাঙাল ভাষায়, আর লাটবেলাট থেকে সুরু করে গাঁয়ের অতি দরিদ্র কৃষকেব সমান সমাদর ও আপ্যায়ন ছিল সেখানে।

চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে মুস্লিম লীগকে কবর দিয়ে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন জনাব ফজলুল হক। তারপর কলকাতায় বেড়াতে এসে পূর্বদিনের বন্ধুদের দেখে ভুলেই গেলেন তিনি তখন ভিন দেশের রাষ্ট্রনেতা, কলকাতা তাঁর কাছে বিদেশ। প্রোটোকলের কোন ধারই ধারলেন না। যে দেশ-বিভাগের সুবাদে তিনি পূর্ব পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সেই দেশবিভাগকে তিনি নিন্দা করে

বসলেন। আরও বললেন, বাঙালী এক ও অভিন্ন, রাজনীতির ছুরি চালিয়ে তাকে দুভাগ করা যাবে না। যা তিনি বলেছিলেন, তাই সত্য হয়েছে আজ। কিন্তু ধুরন্ধর রাজনীতিকদের মতো রেখে-ঢেকে কথা বলেন নি বলে সেদিন ঐ সব কথা নিয়ে তাঁর শত্রুপক্ষ মুস্লিম লীগ কি বিরাট ষড়যন্ত্রই না ফেঁদেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তার জন্য লাঞ্ছনাও তাঁর কম হয়নি, কিন্তু মুখের জবাব ফিরিয়ে নেননি হক সাহেব।

কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। কিন্তু হক সাহেবের ঐ রেখে-ঢেকে কথা বলার কূটনৈতিক শিক্ষা কোনদিনই হয়নি। সরল বিশ্বাসে, অন্তরের তাগিদে অকপট ভাষায় চিঠি লিখে বার বার বেকায়দায় পড়েছেন তিনি, কিন্তু তবুও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ও ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। কিম্বা হয়ত করেছিলেন, তবুও অপরিবর্তনীয় স্বভাবের জন্য প্রয়াস বার বার ব্যর্থ হয়েছে। ১৯২৪ সালে ফজলুল হক যখন মন্ত্রী তখন তাঁর বিরুদ্ধে স্বরাজ্যদলের একদা আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার হয় ঢাকার রায় বাহাদুর পিয়ারীলাল দাসকে লেখা চিঠি। তার পনের বছর বাদে আবার যখন হক মন্ত্রিসভা উৎখাতের জন্য ইংরেজ ও মুস্লিম লীগের মিলিত ষড়যন্ত্র সুরু হয়, তখনও হক সাহেবের বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহারের চেষ্টা হয় তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ফেরায়ওয়েদার তাঁর লেখা দুটি চিঠি। যার একটিতে স্বগ্রামের এক মুস্লিম যুবকের হয়ে তিনি লিখেছিলেন : চল্লিশ বছর আগে আমি যখন এস, ডি, ও, ছিলাম, তখন এর বাবা আমার পাচক ছিল ; তারই নাম করে ছেলেটি এসেছে, বেশি লেখাপড়া জানে না, কিন্তু স্বাস্থ্যবান ; আমি এর বাবার কথা ভুলতে পারি না—যদি এর একটা ব্যবস্থা করে দাও, তো বাধিত হব।

অপর চিঠিতে একটি হিন্দু যুবকের হয়ে লিখেছেন : এর বাবা —দাশগুপ্ত শৈশবে আমার শিক্ষক ছিলেন তাঁরই আশীর্বাদে আমার

জীবনে যা কিছু প্রতিষ্ঠা, তাঁর ঋণ ভুলতে পারি না বলেই এই ছেলেটাকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এর কিছু করতে পারলে আমাকেই সাহায্য করা হবে।

ভাবতেও অবাক লাগে যে উল্লেখিত চিঠি দুখানির লেখক ছিলেন সুবে বাঙলার উজিরে আজম এবং তা লিখিত হয়েছিল অধস্তন এক পুলিশ অফিসারের কাছে। ফোন তুলে বলে দিলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু হাতে লিখলে কাজ বেশি হবে এ কথা ভেবেই তিনি আধুনিক ঝানু রাজনৈতিক নেতাদের ভাষায় ঐ 'কাঁচা কাজ' করেছিলেন। কিন্তু এই কাঁচা কাজের ভেতর দিয়ে যে মানুষটির পাকা পরিচয় পাই, তার তুলনা কোথায়? সব ক্ষুদ্রতা, সব সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে এই যে স্নেহ-মমতা ও ভালবাসায় ভরা পিতৃহৃদয়, সেই তো বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সতীর্থদের মতো 'স্যার' খেতাব ও উচ্চ রাজপদ নিয়ে অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে যাঁর জীবন অতিবাহিত হওয়ার কথা, সে লোক যে চিরকাল খালি গায়ে, লুঙি পরে গাঁয়ের চাষী হয়ে দিন কাটালেন, সে শুধু ঐ দরাজ হৃদয়টুকুর জন্যই। শুধু এই কারণেই বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেদিন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের চেয়ে শিক্ষা দপ্তর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল, আর তাঁর হাত থেকে একের পর এক বেরিয়ে এসেছিল ঋণ সালিশি আইন, দোকান-কর্মচারী আইন প্রভৃতি গরীব, দুঃস্থ, খেটে-খাওয়া মানুষদের স্বার্থরক্ষাকারী আইনগুলি।

বাঙলাদেশের মানুষ কোনদিন তার দুঃখের বন্ধু হকসাহেবকে ভুলতে পারে নি, পারবেও না। কারণ বাঙালী আর যাই হোক, অকৃতজ্ঞ নয়।

কর্মবীর বিধানচন্দ্র

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব



মানুষের কান্নায় কলকাতা মহানগরী যেন ডুবে যেতে বসেছে। পশ্চিমবাঙলা জুড়েও এই কান্না। সারা ভারতের সর্বত্রই।

কেন এই কান্না? একটি দুঃসংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে, তাই চতুর্দিকে হাহাকার। সকলের মুখে এক কথা, বিধানচন্দ্র নেই। আশি বছরের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটেছে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই বেলা দশটায়। ঠিক আশি বছর আগে এমনি দিনেই বেলা দশটায় বিধানচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কবির বাণী—সত্য হয়ে উঠেছে বিধানচন্দ্রে—"জন্মদিন মৃত্যুদিন ; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে, দুই আলো মুখোমুখি মিলেছে জীবন-প্রান্তে।"

সেই বিধানচন্দ্র, সোনার বাঙলার সোনার ছেলে বিধানচন্দ্র—বাঙালীর যে কতখানি ছিলেন, বাঙলার যে কত আপন ছিলেন, তাঁর অভাবে বাঙালী মাত্রেই তা অনুভব করছে।

জীবনের যত ক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন, সেখানেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন বিধানচন্দ্র। সর্বত্রই তিনি ছিলেন অনন্য। চিকিৎসাজগতে শুধু বাঙলা বা ভারতে নয়, সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। ১৯২৩ সালে বাঙলার রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েই তিনি মহীরুহের পতন ঘটালেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাঙলার মুকুটহীন রাজা, ভারতের রাষ্ট্রগুরু। স্বরাজ্য দল সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী বিধানচন্দ্রের কাছে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় নির্বাচনে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে দ্বিগুণেরও অনেক বেশী ভোটে পরাজিত হলেন। ভারতীয় রাজনীতির আকাশে নবতম এই উজ্জ্বল তারকার আবির্ভাবে দেশব্যাপী বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো।

স্পষ্টবাদিতায় বিধানচন্দ্র ছিলেন অতুলনীয়। দেশের সম্মান, দেশবাসীর কল্যাণ এই ছিল তাঁর মুল লক্ষ্য। তার জন্য, যেখানে যেমন কথা বলা তিনি প্রয়োজন বোধ করতেন, তা বলতে কখনও তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা দেখা যেত না। তাঁর এমনি স্পষ্টবাদিতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যার কয়েকটির উল্লেখেই এই নির্ভীক বাঙালীর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি ও এফ. আর. সি. এস হয়ে কলকাতার এম. ডি. বিধানচন্দ্র রায় দেশে ফিরে এসেই তিনশো তিরিশ টাকায় ক্যামবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন। কিছুদিন বাদেই সেই স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ইংরেজ পুঙ্গব

মেজর রাইট। তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের সদস্য। একজন ভারতীয় তিনশো তিরিশ টাকা বেতন পান ওটা তার পছন্দ ছিল না। মনের সে কথাটা তিনি একদিন বলেই ফেলেছিলেন ' বিধান রায়কে। কিন্তু তুখোড় উত্তর পেয়ে মেজর রাইটকে সেদিন স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল। ডাঃ রায় তীব্র ব্যাঙ্গোক্তির কশাঘাতে মেজর রাইটকে জর্জরিত করে তাঁর কথার উত্তরে সেদিন বলেছিলেন—"এডিনবরার ফেলোশিপ ফেল করা এক ভদ্রলোক যেখানে মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন, সেখানে লণ্ডনের এম.আর.সি.পি. ও ইংল্যাণ্ডের এফ. আর. সি. এস. এবং কলকাতার এম. ডি. কেউ একজন তিনশো তিরিশ টাকা বেতন পেলে সেটা কিছু বেশী হয় বৈকি !"

বিধানচন্দ্রের এই উত্তরে মেজর রাইটকে সেদিন লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকতে হয়েছিল। এমনি ভাবে আরো অনেকবার মেজর রাইটকে তার অধীনস্থ শিক্ষক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে জব্দ হতে হয়, ফলে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক বছর আগেই তিনি বাধ্য হয়ে অবসর গ্রহণ করেন এবং বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে ডাঃ রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে বলে যান—"আমি কেন অসময়ে অবসর নিচ্ছি জানেন ? এখানে আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য শিক্ষক থাকতে আমার পক্ষে এই পদ অধিকার করে থাকা শোভা পায় না।" মেজর রাইট ক্যামবেল মেডিকেল স্কুল থেকে চলে যাওয়ার আগেই বিধানচন্দ্রের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলে বর্ণবৈষম্যের নানা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছিল তা বিশেভাবে স্মরণীয়। আগে টুপি খুলে ইংরেজ ডাক্তার ও শিক্ষকদের এবং অন্য যে কোন ইংরেজ রাজ-কর্মচারীকে সম্মান দেখানো হতো, ইংরেজদের সামনে ছাতা মাথায় চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। বিধানচন্দ্র এইসব অবমাননাকর নীতির বিলোপ সাধন করেছিলেন একক সংগ্রামে।

ক্যামবেল স্কুল এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে মোট তেরো

বছর সরকারী কাজ করেন বিধানচন্দ্র। তেরো বছরের সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে ডাঃ রায় নবপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (পরে আর. জি. কর) ভেষজ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং এই কলেজের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণেও তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই বেসরকারী মেডিকেল কলেজটির মতো আরো কত জাতীয় প্রতিষ্ঠান যে বিধানচন্দ্রের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে, তা বলে শেষ করা যায় না। দেশকে গড়ে তোলাই ছিল তার জীবনের একান্ত বাসনা। সুহৃদ সুভাষচন্দ্রের বাহান্নতম জন্মদিনে ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী বিধানচন্দ্র তাঁর বেতার ভাষণে সে কথাই বলেছিলেন। তার কথা—"বাঙলাকে গড়ে তোলার কাজ এসেছে। আমাদের বাঙলা তো অভাবের বাঙলা নয়; আমাদের বাঙলা সুজলা সুফলা, আমাদের সব আছে। শুধু একত্র হয়ে কাজ করা, এক হয়ে আমাদের অফুরন্ত সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। বাঙলার সম্মিলিত চেষ্টায় অনায়াসে অসাধ্য সাধিত হবে। বাঙালী যে যেখানে, যে অবস্থায় আছ, আমি তোমাদের বলি এক হও। কাজ কর।·········তোমরাই পারবে, তোমাদেরই এ কাজ,··· ··· ।"

বাঙলার তরুণ সমাজকে দেশসেবার কাজে আহ্বান জানিয়েই তিনি ক্ষ্যান্ত থাকেননি, নিজে আজীবন গঠনমূলক কাজে আত্ম-নিযুক্ত থেকে দেশবাসীর সামনে বিধানচন্দ্র এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

বাঙলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন বিধানচন্দ্রকে। তাঁর কর্মদক্ষতার ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল আশুতোষের। তিনি দেখেছেন, ১৯১৬ সালে ৩৪ বছর বয়স্ক যুবক বিধানচন্দ্র ফেলো নির্বাচিত হয়েই কিরূপ উৎসাহ নিয়ে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাঁর সেই কর্মতৎপরতা ও সেবা-নিষ্ঠা লক্ষ্য করেই আশুতোষ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণার্থে বিধানচন্দ্রকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর রাজনৈতিক গুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে আশুতোষের নির্দেশেই বিধানচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তথা বাঙলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি সাত বছর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং এই সময়ের অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে একই নির্বাচকমণ্ডলী থেকে তিন তিনবার তিনি বহু ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন।

প্রথমে নিদর্লীয় সদস্য হিসাবে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করলেও বিধানচন্দ্র দেশবন্ধু পরিচালিত স্বরাজ্যদলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই বছরের পর বছর সরকারী বাজেটের সমালোচনায় ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন এবং দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর কংগ্রেস দলভুক্ত হন। আইনসভার সদস্যরূপে বিধানচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের উন্নয়নে এবং হুগলী নদী সংস্কারের প্রশ্নে যে ভাবে সংগ্রাম করে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে ওয়ার্কিং কমিটি যখন সর্বক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার ডাক দিলেন আর সকলের সঙ্গে বিধানচন্দ্রকেও ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করতে হলো যদিও ওয়ার্কিং কমিটির এ সিদ্ধান্ত তাঁর মনপূতঃ ছিল না। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বিধানচন্দ্র ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। তারপর থেকে তিনিও ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য। কিন্তু কংগ্রেসের এক বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে ব্যবস্থাপক সভা বর্জনের নির্দেশ মেনে নিলেও সে নির্দেশের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে ১৯৩০ সালে আইন অমান্যের ডাক এল। প্রথম

সারির নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হলেন, বাঙলায়, আন্দোলন চালাবার ভার পড়লো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপর। কিন্তু তিনিও বেশীদিন বাইরে থাকতে পারলেন না। তখনকার কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আনসারীর নয়াদিল্লীর বাস ভবনে ওয়ার্কিং কমিটির সভা চলছিল। অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে বিধানচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার হতে হলো। দিল্লীর জেলেই বিনা বিচারে তিনি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সেখান থেকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে আসার পর সেই জেল হাসপাতালের ভার পড়লো বিধানচন্দ্রের উপর। মোট আড়াই হাজার বন্দীর জন্য একশত কুড়িটি শয্যা সম্বলিত সেই জেল হাসপাতাল। সেদিনের কারাশাসন অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতের কারা সংস্কারের চিন্তা ডাঃ রায়ের মনকে দোলা দিল।

বিধানচন্দ্র রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ছিলেন ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে এবং দু বছর কাল সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙলায় কংগ্রেসের দলাদলি তখন বেড়েই চলেছে। প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন আসন্ন। দলাদলিতে বিষণ্ণ বিধানচন্দ্র রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে সরে এসে বেশ কয়েক বছর একান্তে চিকিৎসায় ও জনসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন।

ইতিমধ্যে জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ দেশ বিভাগের দাবী তুলেছে। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র পর পর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন কিন্তু গান্ধীবাদীদের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তাঁকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে হলো। সে সময়ে মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে বিধানচন্দ্র পুনরায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করে নিলেন। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা নেমে এলো, আবার আইন সভা বর্জনের ডাক এলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে। বিধানচন্দ্র একমত হতে না পেরে পদত্যাগ করলেন।

কিছুকাল পরেই বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লব বা ভারত ছাড়ো

আন্দোলন শুরু হলো। নেতারা সব গ্রেপ্তার হলেন, সেই সময় বিধানচন্দ্র রায় নানা জনকল্যাণমুলক ব্রতে আত্মনিবেদিত।

মুসলিম লীগ পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান'-এর দাবীতে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম শুরু করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। সেই পরিবেশেই ২রা সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশে যে উন্মত্ততা সে সময় দেখা দিয়েছিল তা এমনই অসহ্য হয়ে উঠেছিল কংগ্রেস নেতাদের কাছে, যাতে তাঁরা অখণ্ড ভারতের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ বিভাগকে মেনে নিতে সম্মত হলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষকে দুটুকরো করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপন করে ধূর্ত ইংরেজ রাজ ভারতের মাটি ছেড়ে চলে গেল।

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন আগেই চক্ষু চিকিৎসার জন্য বিধানচন্দ্র গিয়েছিলেন আমেরিকায়। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। কিন্তু ডাঃ রায় আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পরই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোগ শুরু হয়ে গেল তাঁকে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্বাচিত করার জন্য। ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করলে বিধানচন্দ্রই দলপতি নির্বাচিত হলেন এবং ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী তিনি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে মনের মত করে রূপায়ণে উঠেপড়ে লেগে গেলেন। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হয়ে উঠলো তাঁর দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন। বাঙালীর অন্ন-সংস্থানের সমস্যা তাঁকে এমন ভাবিত করে তুললো যে বাঙালীর বেকারত্ব ঘুচাতে ডাঃ রায় বিবিধ সরকারী প্রকল্প শুরু করে দিলেন। রাজ্য সরকারের পরিচালনায় যে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা তিনি

তাঁরই উদ্যোগে দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত হলো, জন্ম হলো তাঁর মানস কন্যা কল্যাণী উপনগরীর—লবণ হ্রদ অঞ্চলে যে নতুন কলকাতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সেও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়েরই প্রয়াস ও পরিকল্পনার পরিণতি। বিধানচন্দ্রেরই ব্যবস্থাপনায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, বেশ কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এই রাজ্যে। কলকাতাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা আধুনিক শহরে পরিণত করার কত চিন্তাই না বিধানচন্দ্র করেছেন। কলকাতার পাতাল রেল তাঁরই চিন্তার ফল। এককথায় পশ্চিমবঙ্গের যে দিকেই তাকানো যায় বিধানচন্দ্রের সৃষ্টির স্বাক্ষর চোখে পড়ে। যথার্থই তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুল রূপকার।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পর তার নিযুক্ত ট্রাষ্টি বোর্ডের অন্যতম অছি রূপে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলেও ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনেই মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন বিধানচন্দ্র। মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় সেবারের কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত আর সম্পাদক ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র বসু সে উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের দুটি দলের মধ্যে এমন পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল যা ব্যথিত করেছিল মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে। বিধানচন্দ্র সুভাষ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত দলাদলি ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের উর্ধে থেকে কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব এমন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন যার ফলে কংগ্রেস মহলে তিনি সহজেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তারই ফলে সে বছরই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন এবং পরে তাঁকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও গ্রহণ করা হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯৩১ সালে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বাঙলায়, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের দুই গ্রুপের মধ্যে বিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠলে বিধানচন্দ্রের মধ্যস্থতায় তার মীমাংসা সম্ভব হয়।

যে কাজেই বিধানচন্দ্র হাত দিয়েছেন সেখানেই তিনি তাঁর অতুলনীয় সাফল্যের পরিচয় রেখে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯১৬-২৪) এবং হিসেব পর্ষদের সভাপতি (১৯২৪-৩৫) রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিকে তিনি দৃঢ় করে দিয়ে গিয়েছেন এবং অর্থনৈতিক অনেক জটিলতাও তাঁর চেষ্টা ও চিন্তাতেই দূর হয়েছে।

কলকাতা পৌরসভার সঙ্গেও বিধানচন্দ্র দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। প্রথমে অলডারম্যানরূপে সাত আট বছর এবং পরে মেয়র হিসেবে বিধানচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনে নতুন জীবনের সঞ্চার করেন। পৌরসভায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু দাশের আদর্শ অনুসরণ করে চলেন এবং দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি সে সময় যে সাহসের পরিচয় দেন তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩১ সালে টাউন হলে যে সম্বর্ধনা সভা হয় এবং পর বৎসর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যে দ্বিসপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় তাতে মেয়র বিধানচন্দ্র এই দুই বঙ্গমনীষীকে অভিনন্দিত করেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণের পর তাঁর উইলের অন্যতম অছি হিসেবে বিধানচন্দ্রই চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের ভবানীপুরের বাড়ীতে একটি হাসপাতাল ও মেয়েদের নার্সিং শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন তিনিই। ট্রাষ্টি বোর্ড মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে ডাঃ বিধানচন্দ্রকে বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদকপদে নিযুক্ত

করেছিলেন। সেই হিসেবে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল আজও ডাঃ রায়ের কীর্তি ঘোষণা করছে। পল্লী বাঙলার শোচনীয় অবস্থা বিধানচন্দ্রকে বড়ই ব্যথিত করতো, গ্রাম উন্নয়নের জন্য তিনি তাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রাম পুনর্গঠন পর্ষদ এবং দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি।

এমনি আরো কত জনকল্যাণকর সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত বালিকাদের কলেজ ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের পরিচালনার ভারও ছিল তাঁর উপর এবং বিখ্যাত যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার অবধি ছিল না। তিনি আমরণ এই হাসপাতালের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

গান্ধীজী পরিকল্পিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী সঙ্ঘের বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতিও বিধানচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছিলেন গান্ধীজীর ইচ্ছায় এবং তার নিজের বাড়ীতেই এই বোর্ডের কার্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হয় বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতি। যুদ্ধকালে আত্মরক্ষার শিক্ষাদানই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। ছয় লক্ষাধিক প্রবাসী ভারতীয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত ব্রহ্মদেশ থেকে শরণার্থী হয়ে ভারতে উপস্থিত হলে তাদের সেবার জন্য ডাঃ রায় তাঁর জনরক্ষা সমিতির মেডিকেল মিশন তৈরী করে সেই মিশনকে সীমান্তে প্রেরণ করেন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দিলে বিধানচন্দ্রেরই প্রেরণায় বেঙ্গল রিলিফ কমিটি বা বঙ্গীয় আর্তত্রাণ সমিতি গড়ে ওঠে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে সেবাকার্যের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেখানে এক মেডিকেল মিশন প্রেরণ করেছিলেন। বিধানচন্দ্রই প্রথম অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সাল থেকে ছয় বৎসর কাল

এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ডাঃ রায় সর্বভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের নানা উন্নতিসাধন করে তাঁর সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

বিধানচন্দ্র তাঁর পঁচাত্তরতম জন্মদিনের উৎসবে বলেছিলেন— "আমি রাজনীতি বুঝি না। এইটুকুই শুধু জানি, আমার সম্মুখে যে কাজ তা সমাধা করতে হবে। দেশকে আমি সেবা করতে চাই। দেশকে উচ্চে তুলতে চাই। জয় পরাজয় কিছুই নয়। আমার সামনে যে কোন কাজই উপস্থিত হোক না কেন তাতে দেশের, দেশবাসীর উপকার হবে কিনা, সেটাই দেখতে হবে। যে কাজ আমাদের দেশের শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে, তাতেই আমি আত্ম-নিয়োগ করে থাকি।"

বিধানচন্দ্রের এই ভাষণের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তবে রাজনীতি তিনি বুঝতেন না আসলে সে কথা তিনি বলতে চাননি। রাজনীতি সম্পর্কে এখানে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, রাজনীতি তাঁর কাছে বড় কথা ছিল না, দেশের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর মুল লক্ষ্য।

উদার হৃদয় বিধানচন্দ্র দরিদ্র দেশবাসীর জন্য খুবই ভাবতেন। গরীবের উপায় নেই যে গুরুতর অসুখবিসুখে তারা কোন ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। কোথা থেকে ফি দেবে তারা? সেই কথা ভেবেই তাঁর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতিদিনই তিনি নিয়মিতভাবে এক ঘণ্টা করে বিনা ফিতে গরীব রুগীদের দেখে ব্যবস্থাপত্র দিতেন। একি কম কথা? তাঁর মত ব্যস্ত মানুষের পক্ষে দৈনিক এক ঘণ্টা করে দরিদ্র মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা, বাস্তবিকই এ এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

চিরকুমার এই বিরাট পুরুষ জন্মেছিলেন পাটনায় সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর প্রকাশচন্দ্র রায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানরূপে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে মাতা অঘোর কামিনীকে হারিয়ে কষ্টের মধ্যেই বিধানচন্দ্রকে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতে

হয় কিন্তু সেই বিধানচন্দ্রই অতুলনীয় প্রতিভার দীপ্তিতে, অসাধারণ ব্যক্তিত্বে এবং অসামান্য কর্মকুশলতায় উচ্চশির এক বাঙালীরূপে শুধু নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয়রূপে অশেষ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শুধু উপাধি পেয়েছিলেন বলেই নয়, বিধানচন্দ্র বাস্তবিকই ছিলেন 'ভারতরত্ন'। এমন মহীরুহ বাঙালীকে হারিয়ে দেশের মানুষ যে গভীর শূণ্যতাবোধে হাহাকার করবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

শেখ মুজিবুর রহমান

বিশ্ববন্দিত বঙ্গবন্ধু



লাঠি চালিয়ে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে সভাটি ছত্রভঙ্গ করে দিল ইংরেজের পুলিশ। সে ঘটনা ১৯৩৯ সালের।

বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল শের-ই বঙ্গাল ফজলুল হক এবং হাসান শহীদ সোহরাবর্দীর ভাষণ শোনবার জন্য। কিন্তু নির্বিচার লাঠি চালনায় বহু শ্রোতাকে আহত করেই পুলিশ ক্ষ্যান্ত হলো না, অনেককে যথেচ্ছভাবে ধরপাকড়ও করা হলো।

ধৃতদের মধ্যে একটি উত্তেজিত ছাত্রকেও দেখা গেল। ছাত্রটি অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া। বছর আঠারো-উনিশ বয়েস। গোপালগঞ্জ হাইস্কুলের ঐ ছাত্রটিকে সেবারই প্রথম এক সপ্তাহের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। সেই থেকেই কারাগারের হাতছানি তাঁকে অহরহ আকর্ষণ করে চলেছে।

সেদিনের সেই দণ্ডিত ছাত্রটিই পরবর্তীকালের বিশ্ববন্দিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ছাত্রজীবন থেকেই মুজিবুর রাজনীতির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং দরিদ্র বাঙালীর দুঃখমোচনের স্বপ্ন তাঁকে বিভোর করে তোলে।

দরিদ্রের বন্ধু বাঙালীর অবিসংবাদী নেতা জনাব ফজলুল হক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্নেহধন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক জনাব শহীদ সোহরাবর্দীর একান্ত অনুরক্ত হয়ে উঠলেন মুজিবুর রহমান, তাঁদের প্রথমবার দেখেই তাঁদের দেশপ্রেমের আহ্বানে তাঁর মধ্যেও দেশ সেবার একটা অস্থিরতা দেখা দিল।

প্রাক স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশে কিছু-কালের জন্য মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হলেও শেখ মুজিবের প্রগতিশীল মন মানবতার মহত্তর আদর্শেই সর্বক্ষণ আস্থাশীল। তার পরিচয় বারে বারে পাওয়া গিয়েছে বলেই বিশ্বমানবতার ইতিহাসে তিনি এক চিহ্নিত ব্যক্তি।

যতই দিন যেতে থাকে বাঙালীর সর্বাঙ্গীন মুক্তির চিন্তায় মুজিবুর ততই অধীর হয়ে উঠতে থাকেন। সোনার বাঙলা গড়ার স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসে।

বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের যুগ সেটা। সারা ভারতময় বিপ্লব বহ্নি ছড়িয়ে পড়েছে। বৃটিশ নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য গোটা দেশ তখন উন্মাদ প্রায়। সে বছরেই গোপালগঞ্জ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এলেন শেখ মুজিব। কলেজে পড়তে পড়তেই ফজলুল হক সাহেব এবং জনাব সোহরাবর্দী প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

তখনও মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া (বর্তমানের মৌলানা আজাদ) কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে জনাব সোহরাবর্দী মুসলিম লীগের মনোনয়নে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন ফরিদপুর জেলা থেকে। তাঁর নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর। সেই নির্বাচন পরিচালনায় এমনি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল যার ফলে তাঁর অসাধারণ সংগঠন শক্তির স্বীকৃতি হিসেবে মুজিবুরকে খুব কাছে টেনে নিলেন বাঙলার লীগ নায়কেরা।

দেশ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালে। কিন্তু স্বাধীনতা এলো দুইভাগে। চতুর ইংরেজ ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে দিয়ে বিদায় নিল। ভারত, পাকিস্তান পৃথক পৃথক ভাবে শাসন ক্ষমতা হাতে পেল কোটি কোটি মানুষের অশ্রু ও রক্তস্রোতের মধ্যে। ভারতীয় মুজিবুর রহমান রাতারাতি পাকিস্তানী হয়ে গেলেন আরো অসংখ্য ভারতীয়ের মতো। কিন্তু তবুতো তিনি বাঙালী থাকলেনই। এই বাঙালী থাকাটাই মুজিবের সবচেয়ে বড় গৌরব। সেই গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য কিভাবে জীবনদানে তিনি বাব বার এগিয়ে গিয়েছেন তা আজ আর কার অজানা ?

স্বাধীনতার বছরেই কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে স্বাধীন পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় যেয়ে আইন কলেজে ভর্তি হলেন মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে মুজিবের আনন্দ ও অহংকারের অন্ত নেই। কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা ? এ স্বাধীনতা যে তাঁর বাঙালীত্বের আসল গৌরবটুকুকেই মুছে ফেলতে চাইছে !

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই হুকুম এলো করাচী থেকে, পূর্ব বাঙলা বলে পাকিস্তানের কোনো প্রদেশ বা রাজ্যের নাম থাকবে না—পূর্ব বাঙলাকে বলা হবে পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের আর কোনো প্রদেশের নাম পাল্টানো হলো না, শুধু মাত্র পূর্ব বাঙলা নামটির প্রতি এই বিরূপতা কেন ?

খটকা লাগলো অনেক বাঙালীরই মনে। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে সে খটকা দূর করা গেল না।

বিশেষ করে একটা জনরব স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে যে বাংলা ভাষাভাষীরা সংখ্যাগুরু হলে কি হবে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে না—উর্দুই হবে একমাত্র পাক রাষ্ট্রভাষা।

এ সবই যে বাঙালী জাতিকে দাবিয়ে রাখার চক্রান্তমূলক ব্যবস্থা পূর্ব বাঙলায় মুখে মুখেই তা' ছড়িয়ে পড়লো। মোট বার কোটি পাকিস্তানীর মধ্যে শতকরা ছাপ্পান্ন জনের মুখের ভাষা বাংলাকে বরবাদ করে শতকরা ছ'জনের উর্দু ভাষাকেই যখন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, এমন কি বাংলা ভাষাকে উর্দুর সঙ্গে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবী পর্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে প্রত্যাখ্যান করলেন সে সংবাদ পূর্ব বাঙলার মানুষদের রক্তে ঝড় বইয়ে দিল।

গঠিত হলো 'বাংলা ভাষা সংগ্রাম সমিতি'। সংগ্রামও শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মিছিলে মিছিলে ঢাকা শহর মুখর হয়ে উঠলো। একদিন এক মিছিল পরিচালনায় বৃদ্ধ জননায়ক মৌলভী ফজলুল হক পর্যন্ত গুরুতর ভাবে আহত হলেন। দেখতে দেখতে সমগ্র পূর্ব বাঙলা জুড়ে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠলো। বাঙালীত্বের গৌরবে, বাংলা ভাষার দাবীতে গোটা ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে।

কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকায় এলেন কায়েদ-ই-আজম জিন্না। তারিখ ১৯শে মার্চ, ১৯৪৮ সাল। ভালোই হলো। বাঙালীর প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি অন্যায় অবিচারের কারণ পাকিস্তান স্রষ্টার মুখ থেকেই শোনবার সুযোগ পেল পূর্ব বাঙলার পাকিস্তানীরা, তাঁর কাছে অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনারও সুযোগ পেল।

মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সাধারণ

ধর্মঘট পালিত হয়েছে পূর্ববঙ্গে। ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং করে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কয়েকজন সহযোগী ছাত্রনেতাসহ গ্রেপ্তার হলেন। প্রতিবাদ চললো পুলিশী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কয়েকদিন ধরে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্রসমাজ, যুবসমাজের মুখে মুখে তখন একমাত্র আওয়াজ 'বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা, হতেই হবে হতেই হবে।' রাতদিন এই একটি মাত্র দাবী ও এই একমাত্র স্লোগান শুনে শুনে নাজিমুদ্দিনের চোখে ঘুম নেই। অনেক কারসাজি করে মুজিবের নেতা জনাব সোহরাবর্দীকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং শেষপর্যন্ত তিনি জাহাজে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছুলে তাঁকে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েও পূর্ব বাঙলার প্রধান মন্ত্রী, জিন্নার একান্ত বশংবদ খাজা নাজিমুদ্দিন বেশীদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। যুব সমাজের ক্ষোভ তরঙ্গ তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তুললো। এদিকে মুরুব্বি জনাব জিন্না আসছেন। এরকম অবিরাম বিক্ষোভ দেখলে কায়েদ-ই-আজম তাঁর ওপর যে আর আস্থাই রাখতে পারবেন না! এই ভেবে জিন্নার আগমনের চারদিন আগে অর্থাৎ ১৫ই মার্চ তারিখে ছাত্র নেতাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন নাজিমুদ্দিন—বাংলাভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের পর এবং ভাষা আন্দোলনে ধৃত সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মুক্তিদানসহ ছাত্রদের মোট আট দফা দাবী মেনে নিয়ে সাময়িক ভাবে হলেও পূর্ব বাঙলায় তিনি শান্তির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন একটা ভাওতা দিয়ে।

কিন্তু ভাওতা দিয়ে কি আর কোটি কোটি মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যায়? জিন্না সাহেব ১৯শে মার্চ ঢাকায় এসেই রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে যখন সদর্পে ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়, বিশাল জনতা রাগে ক্ষোভে তখন ফেটে পড়ার উপক্রম।

এর পরেও ভালোয় ভালোয় কাটলো আরো কয়টা দিন। ২৪শে

মার্চ কার্জন হলে বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমাবেশে রাষ্ট্র-ভাষার বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে গিয়েই রাষ্ট্রপতি জিন্না যেই বললেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' অমনি শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে এক ইস্পাত-কঠিন তরুণ-কণ্ঠে জবাব এলো—'না, কখনোই নয়।'

কার এমন সাহস, রাষ্ট্রপ্রধানের মুখের ওপর এমন জবাব দিতে পারে? রাগে জ্বলতে লাগলেন জিন্না সাহেব। সভাগৃহ বিস্ময়স্তব্ধ। সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আরো কয়েকটি কণ্ঠের জোরালো প্রতিবাদে জানিয়ে দেওয়া হলো—'না, না, না উর্দু কিছুতেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।'

ক্ষুব্ধ অপমানিত রাষ্ট্রপতি এ অবস্থায় সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানই বুদ্ধিজীবীদের সভায় জিন্নার ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। এমন লোককে ছাত্র-তালিকায় রাখা চলে না, এই বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে তাঁর নাম খারিজ করে দেওয়া হলো।

সদাচরণের মুচলেকা দিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নিতে বলা হয়েছিল মুজিবকে। কিন্তু মুজিব কি মুচলেকা দেবার ছেলে? তিনি এই বলে পরিষ্কার জবাব দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আবার আসবেনই, তবে ছাত্ররূপে নয় অন্যভাবে।

শেখ মুজিবের সেদিনের সে কথা ঠিক হয়েছে, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা জাতির জনক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি তিনি পরম গৌরবে এসে গ্রহণ করেছেন।

ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ যে দুরন্ত দুঃসাহসী ছেলেটির আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সে জীবন এমন একটি সার্থক পরিণতির পথ খুঁজে নিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা খুব বেশী নেই।

বাংলা ভাষার জন্য, বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে পাক সরকারের কত রকম নির্যাতন যে মুজিবুর রহমানকে সহ্য করতে হয়েছে তার দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় বলা যায় জেলখানা বন্দীশালা তাঁর বাড়ীঘরই হয়ে উঠেছিল।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম যুগে ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর সে আন্দোলনের নায়ক হিসেবে মুজিবুর রহমানকে কিছুকালের জন্য জেলে পুরে রাখা হয়। কিন্তু আন্দোলন প্রশমিত হয় না। তখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেখা গেল যে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠছে। এমনি অবস্থায় মাস ছয় না কাটতেই পরের বছর মার্চ মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান' সরকার আবার তাঁকে জেলে আটক করলেন। বন্দী অবস্থাতেই তিনি মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এমনি ভাবেই ছাত্রনেতা মুজিবুর জননেতা হয়ে দেখা দিলেন।

ভাসানীর নেতৃত্ব মেনে চললেও মুজিবুর ছিলেন সোহরাবর্দী-পন্থী এবং বাঙালীর দরদী নেতা মৌলভী ফজলুল হকের ভাবশিষ্য। জিন্নার রহস্যজনক মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালের শেষভাগে করাচীতে 'জিন্নাহ আওয়ামী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। সেই থেকেই অতি দ্রুত পট পরিবর্তন চলতে থাকে উভয় পাকিস্তানে। পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এক সময়ে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেন। তার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী হঠাৎ রাওয়ালপিণ্ডির এক সভায় ভাষণ দেবার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে পাক প্রধানমন্ত্রীর তখতে অধিষ্ঠিত হলেন নাজিমুদ্দিন।

বাঙালী হলে কি হবে, বাঙালীর স্বার্থের কথা কখনো নাজিমুদ্দিন ভাবেন নি। পূর্ববঙ্গের গভর্ণর থাকতেও নয়, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েও নয়। মুসলিম লীগের স্বার্থই ছিল

তাঁর স্বার্থ এবং জিন্না-লিয়াকত গোষ্ঠীর সেবাকেই তিনি পরমার্থ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

সেই পুতুল পাক প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকায় এসে বিখ্যাত পল্টন ময়দানে যেই জিন্না-লিয়াকতের সেই কুখ্যাত ঘোষণা করে বললেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', সঙ্গে সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারীর পটভূমিকা তৈরী হয়ে গেল।

শেখ মুজিব তখন জেলে। কিন্তু তাঁর নামই তখন থেকে সংগ্রামী প্রতীক হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাঁর নেতৃত্বে আস্থাশীল বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ গর্জে উঠলো নাজিমুদ্দিনের ঘোষণায়। 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে প্রতিবাদে প্রতিবাদে তারা সারা পুর্ববাঙলার আকাশ বাতাস মুখর করে তুললো। বয়স্করা এতদিন দূরে থাকলেও 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠন করে, মৌলানা ভাসানীকে তার নেতৃত্বে রেখে সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পেতে থাকলো। এই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ থেকেই ঘোষিত হলো, একুশে ফেব্রুয়ারী 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হবে সারা পুর্ববঙ্গে, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।

একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তরাঙা প্রভাত এলো। ঠিক যেন স্বাধীনতার সূর্যকরোজ্জ্বল তোরণদ্বার। মিছিলে মিছিলে সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য আর কেবল একমাত্র ধ্বনি, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে, করতেই হবে।'

ধরপাকড় এবং ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। তারপর বিকেল তিনটের পর থেকে আরম্ভ হয়ে গেল নির্মম গুলি বর্ষণ। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কয়েকটি সোনার ছেলে—বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার। রাতারাতি শহীদ মিনার গড়ে উঠলো। তার উদ্বোধন করলেন পুত্রহারা জননী শহীদ বরকতের মা।

বাঙলাদেশ নাম তখনো হয়নি। কিন্তু সে নামে নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি সেদিনই প্রতিষ্ঠিত হলো শহীদের রক্তভেজা মাটিতে।

আশ্চর্য মানুষ তখনকার পুর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সরকারের প্রধান মন্ত্রী নুরুল আমিন। তাঁর একটুও সঙ্কোচ হলো না ছাত্র হত্যা সমর্থন করতে। তিনি বুঝতেই পারেন নি পুলিশী নির্মমতার সমর্থনে তিনি যখন আইনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর ও মুসলিম লীগের ভাগ্যদেবতা ক্রুর হাসি হাসছিলেন।

মুজিবুর তখন ছিলেন জেলে। বিষাদময় একুশের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। বাঙলার ছাত্রছাত্রীরা যে তার ভাইবোন!

প্রতিশোধ এর নিতেই হবে, মনে মনে সঙ্কল্প করলেন মুজিবুর।

এদিকে ছাত্রসমাজ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে লীগ সরকারের অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে। পঁচিশে ফেব্রুয়ারীর সেই ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্যে আসন্ন গণ অভ্যুত্থানের লক্ষণ লক্ষ্য করে বেশ ভড়কে গেল নুরুল আমিনের সরকার। আইন সভার জরুরী বৈঠক আহ্বান করে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হলো এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিও ঘোষিত হলো।

মুজিবুর জেল থেকে বেরিয়েই সোজা চলে গেলেন আজমপুরের কবরখানায় যেখানে একুশের চার ভাষা-শহীদ চিরশায়িত রয়েছেন। অশ্রুর অঞ্জলিতে শহীদদের সালাম জানিয়ে আবার মুজিব সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার।

দেখতে দেখতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। প্রতিজ্ঞা নিলেন পূর্ব বাঙলার জননায়কেরা, পাকিস্তান পয়দা করার জন্য ১৯৪৬ সালে তাঁরা মুসলিম লীগকে বিজয়ী করে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, এবার তাঁরাই সেই মুসলিম লীগকে বাঙলার মাটি

থেকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করবেন। একুশ দফা দাবীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হলো।

ইতিমধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে আর এক তাঁবেদার বাঙালী, মার্কিন প্রসাদপুষ্ট বগুড়ার মোহম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো হলো। সে বেচারা পাকিস্তানকে আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে যত রকমে সম্ভব নির্বাচনে মুসলিম লীগকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু চৌদ্দ হাজার যুক্তফ্রণ্ট কর্মীকে আটক করে এবং মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে ষাট হাজার মোল্লাকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলিয়ে প্রচার চালালেও তাতে কোন ফল হলো না। পূর্ববাঙলার মুক্তবুদ্ধি তরুণ সমাজ ধর্মের আফিম সেবন করে আর ঝিমুতে রাজী নয়। যুক্তফ্রণ্টের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ থেকে সত্যি সত্যি মুছে গেল মুসলিম লীগ।

যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচিত নেতা মৌলভী ফজলুল হক সাহেব পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় মাত্র ৩৪ বছর বয়স্ক তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী রূপে। কিন্তু এই হক মন্ত্রিসভা টিকলো না বেশিদিন। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় পাক সরকার পূর্ববঙ্গে হক সাহেবের আধিপত্য সহ্য করতে চাননি প্রথম থেকেই। শুরু থেকেই তাঁদের চেষ্টা, কি করে উৎখাত করা যায় হক মন্ত্রিসভা। সরকার গঠনের কিছুদিন পরেই হক সাহেব পশ্চিমবঙ্গে এলেন তাঁর পুরনো বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে সময়ে নেতাজীভবনে ও অন্যান্য সম্বর্ধনা সভায় 'দুই বাঙলার সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ, করার আহ্বান জানালেন তিনি। তাঁর সে সব বক্তৃতার ওপর রঙ চড়িয়ে অনেক রিপোর্ট গেল কেন্দ্রীয় মুরুব্বিদের কাছে। এদিকে মুসলিম লীগ নেতাদের প্ররোচনায় নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলের অবাঙালী কর্মীরা বাঙালীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। বহু জীবনহানি ঘটলো তাতে। আর সেই অজুহাতে

পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী মোহম্মদ আলী করাচীতে হক সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে তিন মাসের মধ্যেই তাঁর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন এবং ঢাকায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হক সাহেবকে তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ করা হলো। পাক প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা পূর্ব বাঙলার গভর্ণর হয়ে রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করলেন। শুরু হলো সন্ত্রাসের শাসন। মীর্জা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেই ক্ষ্যান্ত হলেন না, জনবিক্ষোভ নিষিদ্ধ হলো এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষ নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানসহ হাজার চার নেতা ও কর্মীকে জেলে পুরে দেওয়া হলো।

বছর খানেক যেতেই পাকিস্তান শাসনে পাঞ্জাবীদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ পশ্চিম পাকিস্তানের সব কটি প্রদেশকে 'এক ইউনিট' ভুক্ত করে নিলেন অপর ইউনিট পূর্ববঙ্গের (তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের) সংখ্যাগুরু বাঙালীর অধিকার ক্ষুন্ন করে দুই অংশের মধ্যে বাহ্যিক সমতা দেখানোর উদ্দেশ্যে।

নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। বাঙালী মহম্মদ আলীর স্থলে পাঞ্জাবী চৌধুরী মহম্মদ আলী এবার প্রধানমন্ত্রী হলেন। মন্ত্রিসভায় পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে আইন মন্ত্রী করা হলো সোহরাবর্দীকে এবং পূর্ববঙ্গের গভর্ণর ইস্কান্দর মীর্জাকে নিয়ে আসা হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে। কিছুদিন বাদেই মীর্জাকে অস্থায়ী গভর্ণরের দায়িত্ব দিয়ে এবং হক সাহেবকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বসিয়ে গোলাম মহম্মদ চিকিৎসার জন্য হঠাৎ ইউরোপে চলে গেলেন। চারিদিকে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল।

এমনটিই তো চেয়েছিলেন পাক কর্তৃপক্ষ। একটা তালগোল পাকিয়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গকে কোণঠাসা করে ফেলা, এই ছিল তাদের

লক্ষ্য। বাঙালী নেতারা বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ রেখেছিলেন সে দিকে।

শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই ইস্কান্দরের প্রথম চিন্তা হলো পূর্ববাঙলার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে ঘায়েল করা। সে উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি পাকিস্তানকে ইসলামী গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করে তিনিই তার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলেন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হককে পূর্ববাঙলার প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়ে আগেই নাজেহাল করা হয়েছিল। আর এবার তাঁকে করা হলো কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আরো প্যাঁচ কষলেন মীর্জা সাহেব। হক সাহেবের মনোনীত এবং তাঁরই কৃষকপ্রজা পার্টির অন্যতম নায়ক আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত করা হলো আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নায়ক সোহরাবর্দীকে। ব্যস, অমনি কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন হলো এবং কায়েম হলো আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্ব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে। আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভায়ও মন্ত্রী হলেন মুজিবুর রহমান। কিন্তু এ মন্ত্রিসভাকেও বেশীদিন থাকতে দেওয়া হলো না। কৌশলে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিলেন ইস্কান্দর মীর্জা। ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়লেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যা ন্যাপ নামে সুপরিচিত।

এর পরেও চলতে থাকলো মীর্জার চতুরতা। তিনি হঠাৎ সোহরাবর্দীকে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করে প্রথমে চুন্দ্রীগড় এবং পরে ফিরোজ খাঁকে গদীতে বসিয়ে ফজলুল হক সাহেবকে পূর্ববঙ্গের গভর্ণর করে পাঠিয়ে দিলেন।

এর ফলে পূর্ববঙ্গে যা হবার তাই হতে লাগলো। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে আবু হোসেন মন্ত্রিসভাই আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন হক সাহেব। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ভোটে

পরাজয় মানতে হলো আবু হোসেন সরকারকে এবং হক সাহেবকেও বিদায় নিতে হলো গভর্ণরের পদ থেকে।

এর পর কিছুদিন অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটতে লাগলো। যেমন পূর্ববঙ্গে তেমনি কেন্দ্রে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হতে থাকলো। হঠাৎ ১৯৫৮ সালের ৮ই অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দর মীর্জা সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তন করে বসলেন। আয়ুব খান হলেন চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

গোটা দেশ জুড়ে সন্ত্রাসের স্তব্ধতা নেমে এলো। ২৪শে অক্টোবর আয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রেসিডেণ্ট মীর্জা বারজনের এক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট ভবনে যেয়ে উপস্থিত হলেন জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর তিন জেনারেল। তাঁদের হাতে প্রেসিডেণ্টের কাছে লেখা প্রধান-মন্ত্রী আয়ুব খানের চিঠি এবং একখানি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিন জেনারেলের উদ্যত পিস্তলের মুখে অসহায় প্রেসিডেণ্ট মীর্জা সেই দলিলে সই করে দিয়ে আয়ুব খানের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে পদত্যাগে বাধ্য হলেন। আর কোনদিন দেশে ফিরবেন না, এই শর্তে মীর্জা সাহেব সস্ত্রীক লণ্ডনে চলে গেলেন।

ক্ষমতা দখলের পরদিনই আয়ুব নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট বলে ঘোষণা করলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদটি তুলে দিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এই মন্ত্রিসভায় চারজন বাঙালীকে স্থান দেওয়ায় বাঙালীরা খুশী হলো। আয়ুব একাধারে প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রিসভার প্রধান এবং জল-স্থল-বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। পুরোপুরি ডিক্টেটর হয়ে তিনি চমকের পর চমক সৃষ্টি করে চললেন। প্রথমেই কালোবাজারী দমনে মেতে উঠলেন, শিল্প-সংস্থা গড়তে শুরু করলেন, চারদিকে রাস্তাঘাট হতে লাগলো—সবাই খুশী। কিন্তু হঠাৎ যখন তিনি তাঁর ইচ্ছামতো অফিসার ছাঁটাই ও বদল করতে লাগলেন এবং অনেককে নীচে ফেলে জেনারেল মুসাকে প্রধান

সেনাধ্যক্ষ করলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। কিন্তু আয়ুবও চতুর ব্যক্তি। তিনি ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তেষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ে করাচীর বদলে রাওয়াল-পিণ্ডিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলো—ধর্মান্ধ মুসলমানদের খুশী করার জন্য। তার নূতন নাম দেওয়া হলো ইসলামাবাদ। অভিনব বুনিয়াদি গণতন্ত্র প্রবর্তন করে আয়ুব তার অনুগত আশী হাজার গণতন্ত্রীকে দিয়ে নিজেকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করিয়ে নিলেন এবং ১৯৬৬ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না—এমন এক আদেশও আয়ুব ঘোষণা করে দিলেন। তারপর প্রেসিডেণ্টের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে তিনি এমন শাসনতন্ত্র উপহার দিলেন দেশকে যে শাসনতন্ত্রে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী পাক নাগরিকের পক্ষে প্রেসিডেণ্ট হওয়া নিষিদ্ধ হলো। অপূর্ব গণতন্ত্রই বটে !

পূর্ববাঙলায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব আগে থেকেই দ্রুত বেড়ে চলেছিল। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন আয়ুব খান। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি মুজিবুর ও প্রভাবশালী অন্যান্য বাঙালী নেতাদের জেলে পুরে দিয়েছিলেন। তাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল পূর্ববাঙলা। ১৯৬০ সালে মুজিবুর মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু ১৯৬২ সালে শহীদ সোহরাবর্দীর পর শেখ মুজিবকে জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে আটক করা হলো। ছয়মাস বিনা বিচারে আটক থাকার পর মুক্তি পেয়েই শেখ পাকিস্তানের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করতে লেগে গেলেন এবং পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে আয়ুবখানের বিরুদ্ধে জিন্না-ভগিনী ফতেমাকে আয়ুবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়ে দিলেন। ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে এবং সর্ব প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে আয়ুব নির্বাচনে বিজয়ী হলেও মুজিবুর রহমানকে দমন করার উদ্দেশ্যে মোক্ষম এক দাওয়াই বেছে নিলেন।

পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে মুজিবুর রহমান ও অপর পঁয়ত্রিশ জনকে ধরে জেলে পুরে দেওয়া হলো এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাও শুরু হলো। এই মামলাই কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা নথিপত্রে সই করিয়ে নেবার জন্য শেখ মুজিবের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলেন আয়ুব সরকার, মুজিব তাঁর জবানবন্দীতে তার এক চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। সে বিবরণ প্রকৃত পক্ষেই এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে। কোন সরকার যে এত বড় মিথ্যা মামলা সাজাতে পারে তা ভাবাই যায় না। এই রকম মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার ফলে পূর্ব বাঙলা জুড়ে যেভাবে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠলো, জবরদস্তি তা নেভাতে গিয়ে কতকগুলি প্রাণহানি ঘটলো বটে কিন্তু তাতে কোনো ফলই হলো না। আয়ুব খাঁ ঢাকায় এসে সরেজমিনে সব পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, অবস্থা সঙ্গীন। পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় ১৪৪ ধারা অমান্য চলছে। গোলাগুলিতে অনেক মানুষ হতাহত হচ্ছে, সেদিকে জনতার ভ্রুক্ষেপ নেই। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদ দিবস বিপুল উৎসাহে পালন করা হবে, এই সঙ্কল্প নিয়েছে বাঙালী তরুণ সমাজ। কয়েকদিন আগে থেকেই তার মহড়া দিতে গিয়ে বেশ কিছু কচি প্রাণ নষ্ট হয়ে গেলে উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল।

সব দেখে শুনে সুর নরম করলেন আয়ুব খান। ১৪৪ ধারা ও মিলিটারী তুলে নেওয়া হলো। শান্তিতেই শহীদ দিবস পালিত হলো। পরদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেওয়ার কথা ঘোষিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আটক নেতৃবর্গও মুক্তি পেলেন।

১৯৬৯-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক ঐতিহাসিক তারিখ। ঐ দিন ঢাকা রেস কোর্সের বিশাল জনসভায় যেভাবে শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জানানো হলো তার কোনও তুলনা হয় না। সেখানেই শেখকে তাঁর দেশের মানুষ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলেন। এদিকে এক মাসের মধ্যেই জানা গেল, আয়ুবখান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান গদীতে আসীন হয়েছেন।

দশ বছরের কলঙ্কিত আয়ুবশাহীর অবসান হলো বটে, কিন্তু শুরু হলো ইয়াহিয়া শাসনের আর এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এপ্রিল মাস জুড়ে পূর্ব বাঙলার জেলায় জেলায় অত্যাচারের তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হলো। এদিকে সোচ্চার দাবী উঠলো সাধারণ নির্বাচনের জন্য। জনপ্রিয়তা লাভের আশায় ইয়াহিয়া এক ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন ১৯৭০ সালের মধ্যেই গোটা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল, কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কাজেই ক্ষমতা তাঁর হাতেই থাকবে। কিন্তু কার্যত তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো।

এরমধ্যে আগষ্ট মাসে পূর্ববঙ্গে প্রবল বন্যা এবং নভেম্বরে ঘূর্নিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রায় বিশ লক্ষ বাঙালীর প্রাণহানি ঘটলো, কিন্তু কেন্দ্রীয় পাক সরকারের তেমন সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গেল না। বঙ্গবন্ধু সে সময় যে সেবার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। জনমনে শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী লীগের স্থান এতে আরো পাকা হয়ে গেল। তার পরিচয় পাওয়া গেল ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে। জাতীয় পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক বিধান সভায় পূর্ববঙ্গে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে উভয় ক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো মুজিব পরিচালিত আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে মুজিবকে অভিনন্দিত করলেন প্রেসিডেন্ট

ইয়াহিয়া খান, কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলেন। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় হবে স্থির হলেও তারিখ নিয়ে তিনি টালবাহানা শুরু করে দিলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনকেই বানচাল করে দেবার মতলব আঁটছিলেন তিনি। তাই ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও ভুট্টোর পরামর্শে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সে অধিবেশন তিনি স্থগিত রাখলেন ১লা মার্চের ঘোষণায়।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৩রা জানুয়ারী বিশ লক্ষ লোকের সভায় বাঙালীর নেতা মুজিবুর রহমান যে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন স্বাধিকারের দাবী ঘোষণা করে। সেই বক্তৃতা ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো প্রভৃতির মনে এমন একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল যাতে ভুট্টো সাহেব ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করবেন জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইয়াহিয়া সরকার কঠোর হাতে বাঙালীর স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন দমনে সামরিক বাহিনী নামিয়ে দিলেন। বহু মানুষ হতাহত হলো পূর্ববঙ্গে। ইয়াহিয়া বেগতিক দেখে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন ঢাকায়। এদিকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ডাকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে পূর্ববঙ্গে।

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'—মুজিবের এই ঘোষণা বাস্তবিকই শেষ পর্যন্ত সত্য হলো। ১৫ই মার্চ ঢাকায় এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কয়েকদিন ধরে শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করে চললেন এবং অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমানে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য আমদানী হতে থাকলো। ২১শে মার্চ ভুট্টো সাহেবও ঢাকায় এলেন এবং পরপর দু'দিন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসলো। রটে গেল, মুজিবের ছয়দফা দাবীর ভিত্তিতে বাঙলা-দেশকে স্বাধিকার দানে একমত হয়েছেন ইয়াহিয়া খান। কিন্তু

এসবই যে নিছক ষড়যন্ত্র ২৫শে মার্চের মধ্যে তা জানাজানি হয়ে গেল। ঐদিন প্রায় মধ্যরাতে পাক সৈন্যরা বেপরোয়া আক্রমণে ঢাকা শহরকে নরকে পরিণত করলো। শেখ মুজিবুব রহমানকেও ধানমণ্ডির বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেণ্টে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলে।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। অস্থায়ী স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকার গঠিত হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেণ্ট করে। ত্রিশলক্ষ বাঙালী নরনারী বলি হলো পাকিস্তানী বর্বরতায়। এক কোটি বাঙালীকে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতের মাটিতে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে সেই যুদ্ধের সময়। ভারতের মাটিতেই বাঙলাদেশ মুক্তি বাহিনী গড়ে উঠেছে এবং তারা ভারতেই গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই আশা, শেখ মুজিব যখন তাদের নেতা জয় তাদের সুনিশ্চিত। আরো আশা, যে ভারত আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে এবং সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছে সে ভারত যুদ্ধেও তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। ভারতের সাধারণ মানুষও তেমনি আশাই করেছিল এবং সে প্রত্যাশা মিথ্যে হয়নি। ২রা ডিসেম্বর পাক বিমান বাহিনী ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে দুদিন ধরে অঘোষিত যুদ্ধ চলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। ৪ তারিখে পাকিস্তান সরকারী ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতের বিরুদ্ধে। প্রায় আট মাস পর সমস্ত আটঘাট বেধে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন ৬ই ডিসেম্বর তারিখে এবং দশ দিনের মধ্যেই পাক বাহিনীকে ঢাকায় আত্মসমর্পণে বাধ্য করলেন।

'ইন্দিরাজী কি জয়', 'বঙ্গবন্ধু কি জয়', 'স্বাধীন বাঙলা দেশ কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো, নতুন জাতীয় পতাকা উড়তে থাকলো প্রতি গৃহশীর্ষে। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় অনন্দে সবাই আত্মহারা। কিন্তু এই আনন্দের কালে, উৎসবের

পরিবেশে কোথায় সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যাঁর নামোচ্চারণে এমন কি যাঁর নাম স্মরণে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী নববলে বলীয়ান হয়ে সর্বস্বত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে! তিনি তখন ইয়াহিয়ার গৃহবন্দী হিসেবে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া যে অল্প আগেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন! মুজিবের মুক্তির জন্য নতুন পাক প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ওপর চাপ এলো পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। সে চাপ সৃষ্টির মূলে রয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর আবেদন সমস্ত দেশের কাছে। তাতে কাজ হলো। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সব দিক ভেবে শেখ মুজিবের মুক্তি ঘোষণা করলেন। মুক্ত মুজিব লণ্ডন ও দিল্লী হয়ে যেদিন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাঙলাদেশের পুণ্য ভূমিতে এসে পা রাখলেন সেদিন যে আনন্দ-উদ্বেল দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল দেশ বিভাগের পর ভারত উপমহাদেশে তেমন দৃশ্য আর কখনো দেখা যায়নি।

বাস্তবিকই শেখ মুজিব যেন রূপকথার এক বিজয়ী রাজা। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তিনি যেন তাঁর রাজধানীতে ফিরে এলেন বিজয়ীর গৌরব নিয়ে! সুপণ্ডিত ডঃ আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে বসিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজে হলেন নতুন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাধের বাঙলাদেশকে সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত একটি প্রগতিশীল দেশে পরিণত করার জন্য।

শেখ মুজিবুর রহমান একটি সার্থক নাম। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতোই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় অমর একটি জীবন!



বিদ্রোহী কবি
নজরুল ইসলাম



কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে লোক আর ধরে না। গিজগিজ করছে হাজার হাজার মানুষ। বিচার হবে আজ কবির। অগ্নিবীণার কবি—বিদ্রোহী কবি নজরুলের। কবির অপরাধ, তিনি গেয়েছেন স্বাধীনতার গান। দিয়েছেন শেকল ভাঙার আহ্বান। দশভুজা দুর্গার বন্দনায় কবি প্রশ্ন করেছেন—

'আর কতকাল থাকবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি—চাঁড়াল।

দেব-শিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,
আসবি কখন সর্বনাশী?

'ধূমকেতু' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতায় শাসক ইংরেজ সরকারের টনক নড়লো। শঙ্কিত হয়ে উঠলো বিদ্রোহের। ডাকে। সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র সব কপি বাজেয়াপ্ত করা হলো। কবি সম্পাদককে করা হলো গ্রেপ্তার। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম হলেন বন্দী। মাথায় বাবরি একরাশ ঝাঁকড়া চুল। বড় বড় দুটি চোখ। গোঁফ দাড়ি কামানো ভরাটমুখ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কবি তাঁর স্বপক্ষে বললেন—

"আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি আজ এই আসামীর পেছনে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারেন না। এমনি বিচার প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুসবিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের পেছনে এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পাননি। তাঁর আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে বিচারকের বিবেক, দৃষ্টি অবাক হয়ে গেছলো।"

বিদ্রোহী কবি তাঁর জবানবন্দীতে আরও বলেছেন, "ভারত আজ পরাধীন। অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ! এতো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না ...... এ অন্যায় শাসন-লিখা বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী?"

তবুও বিচারে বিদ্রোহী কবি নজরুল হলেন অপরাধী ম্যাজিস্ট্রেট

সুইনহো কবি নজরুল ইসলামকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এক বছরের জন্য। ঘটনাটি ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৩ সালের।

কিন্তু বিদ্রোহী কবি ইংরেজ সরকারের 'রক্তচক্ষু' দেখে ভয় পেলেন না। বন্দীশালা থেকেই তিনি গেয়ে উঠলেন—

'আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না'—

"এদেশের নাড়িতে-নাড়িতে, অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না। ……… মানুষধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।"

বিদ্রোহী কবি তাই বিদ্রোহের অর্থ সহজ কথায় প্রকাশ করে লিখলেন—"বিদ্রোহ মানে কাউকে না মানা নয়; বিদ্রোহ মানে যেটাকে বুঝি না সেটা মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। …… সত্যকে জানবার জন্য বিদ্রোহ চাই। নিজেকে শ্রদ্ধা, প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই। বিদ্রোহের মত যদি বিদ্রোহ করতে পারো, প্রলয় যদি আনতে পারো, তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই।"

'ধূমকেতু' হলো বিদ্রোহী কবির কাছে মুক্তিযুদ্ধের রথ। কবির কথায়—

'আমি যুগে যুগে আসি,
আসিয়াছি পুনঃ মহা-বিপ্লব হেতু …।'

নতুন যৌবনের প্রতীক কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত 'ধূমকেতু'কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সমর্থন জানালেন। মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করলেন,—

"আয় চলে আয় ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,

দুর্দিনে এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা,
জাগিয়ে দেবে ধমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।'

অন্যায় অত্যাচার নজরুল কখনো সহ্য করতেন না। একবার কবি নজরুল তাঁর এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিলেন বরযাত্রী হয়ে। অন্য বন্ধুরা সব কুলীন ব্রাহ্মণ। তাই বিয়ে-বাসরে আর সব বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়ন করলেও কেউ কবির প্রতি চোখ তুলে তাকালো না। সবাই তাঁকে অচ্ছুৎ একঘরে করে রাখলো। এ অন্যায় অপমানে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে বিয়ের চিঠিব অপর পৃষ্ঠায় খস্ খস্ করে লিখে ফেললেন ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে, কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী এক কবিতা। তাতে কবি বললেন—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া!
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতের জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান্।
এখন দেখিস ভারত জোড়া—
পচে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া!'

বিয়ে বাড়ীর সকলের মাথা হেঁট। কবির আবার জাত! জাতের নামে বজ্জাতি। কনে পক্ষ করজোড়ে মাফ চাইলেন নজরুলের নিকট। আপনভোলা কবিও সব ভুলে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জাতের দোহাই কেউ আর পারলো না।

নজরুল ছিলেন তরুণের কবি। যৌবনের প্রতীক। শুধু কবিতা নয়, গানেরও ছিলেন নজরুল মহান স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলও অজস্র গান রচনা করেছেন, গেয়ে গেছেন, আবৃত্তি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন দেশী বিদেশী রকমারি সুরে গান বেঁধে গেছেন, নজরুলও তেমনি দেশী বিদেশী হরেক রকম সুরে হরেক রকম গান বেঁধেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব দেখা যায়, নজরুলের গানেও তেমনি আরবি, ফার্সি, তুর্কি মধ্যপ্রাচ্যের বিবিধ সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো নজরুলসঙ্গীতও ঘরে ঘরে আজ সমাদৃত।

বর্ধমান জেলায় চুরুলিয়ার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ এবং ইংরেজি ২৪শে মে, ১৮৯৯ সালে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহম্মদ, মাতার নাম জাবেদা খাতুন। ছোট বেলায় নজরুলের ডাক নাম ছিল 'তুখু মিয়া'। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁর শৈশব কাটে। আট বৎসর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং ছোট বেলায় নজরুল লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পাননি, পাড়াগাঁয়ে আর পাঁচটি ছেলের মতো অযত্ন অনাদরেই বড়ো হয়ে ওঠেন তিনি। তবে অল্প বয়সেই তাঁর কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ঘটে। উর্দু, ফার্সি, আরবি মিশানো 'মুসলমানী বাংলায়' তাঁর কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়। মাত্র এগার বছর বয়সে 'লেটোর দল' নামের গ্রাম্য গানের দলে ঢুকে পড়েন তিনি সামান্য রোজগারের আশায়। প্রথমে গান লিখে দেওয়া, তারপর গান শেখানো এবং পরে এই 'লেটোর দলে'র নেতৃত্বও করেছেন তিনি। এই গানের দলে আসার আগে আসানসোলে পালিয়ে এসে একটা রুটির দোকানে 'বয়'-এর কাজও করতে হয়েছিল বাঙালীর জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে। আসানসোলের দারোগা রুটির দোকানের সেই বছর নয় বয়সের ছেলেটিকে স্নেহ-পরবশ হয়ে নিয়ে গেলেন ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর নিজের গ্রাম দরিরামপুরে। সেই গ্রামের স্কুলেই তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বাংলা ১৩১৯ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা গেল একখানি খাতায়

সব উত্তরই লেখা হয়েছে কবিতায়। শিক্ষক মহাশয়রা অবাক হলেন, ছাত্র মহলেও অপার বিস্ময়। নজরুলকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল স্কুলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে যে তিনিই সমস্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখেছেন কবিতায়।

এর পরেই নজরুল আবার তাঁর জন্মস্থানে ফিরে আসেন। অল্প কিছুকাল আসানসোলের মাথরুন ইংরেজী স্কুলে পড়ার পরেই 'লেটোর দলে'র সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে অবস্থায়ই রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হয়ে একটানা তিন বছর লেখাপড়া করেন সেখানে। বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেখানেই তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়। থার্ড ক্লাস থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছিলেন ওরা দুই বন্ধু। প্রি-টেষ্ট পরীক্ষাও দিলেন একসঙ্গেই। হঠাৎ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। প্রথম মহাযুদ্ধ। ১৯১৪ সাল। দুই বন্ধু আসানসোলের মহকুমা হাকিমের অনুমোদন পত্র নিয়ে চলে এলেন কলকাতার সৈনিক দলে ভর্তি হবার জন্য। উদ্দেশ্য ইংরেজের কাছে লড়াইয়ের কৌশলটা শিখে নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়াইতে প্রবৃত্ত হওয়া।

লম্বা চওড়া শক্তিমান নজরুলকে দেখেই সৈনিকদলে ভর্তি করা হলো, শৈলজানন্দের সৈনিক হবার সখ মিটলো না। তিনি বাড়ীতে ফিরে গেলেন। নজরুল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলে গেলেন সুদূর করাচীতে। তখন বয়েস তাঁর মাত্র সতেরো। তাঁর আগে থেকেই ভারতবর্ষকে ইংরেজের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার স্বপ্ন দেখছিলেন নজরুল আর শৈলজানন্দ। আর সেই প্রেরণাতেই করাচীর গলজা লাইনের সৈনিক ব্যারাকে থেকেও গানের পর গান এবং কবিতার পর কবিতা নজরুল রচনা করে চলেছেন স্বাধীনতার বন্দনায়।

করাচীতে কবি নজরুল মোট তিন বছর সৈনিক জীবন যাপন করেন। তাঁর 'রিক্তের বেদন' গল্পের বইখানিও সেখানে বসেই

লেখা এবং সেখানেই বাঙালী পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছে তিনি ফার্সি ভাষা শিক্ষা করে প্রায় যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ফার্সি কাব্য পড়ে ফেলেন। করাচী থাকতেই কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র সম্পাদক মোজাফ্ফর আহমেদ সাহেবের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ঐ সমিতিরই মুখপত্র 'মোসলেম ভারত' সাহিত্য পত্রে নজরুল তাঁর রচনা মাঝে মাঝে পাঠাতে থাকেন।

কলকাতায় ১৯১৯ সালে করাচী থেকে ফিরে এসেও নজরুল প্রথমে মোজাফ্ফর আহমেদ সাহেবের বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সে বাড়ীতে বসেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী', যে কবিতাটি 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙলায় একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের সমস্ত মানুষকে ডেকে তিনি বললেন—

'বল বীর,
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি
নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।'

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে জাতিকে কবি সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে অত্যাচারী ইংরেজরাজকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত শান্ত হওয়া চলবে না, বিদ্রোহ চলতেই থাকবে।

নজরুলের এই ঘোষণায় বাঙলার বিপ্লবীকুল যোগ্য এক কবি-দার্শনিককে পেয়ে তাঁকে ঘিরে রাখলো। তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'অগ্নিবীণা' কবি বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ অগ্নিঋষি বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে উৎসর্গ করে 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় লিখলেন—

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।'

সশস্ত্র বিপ্লবের পাশাপাশি মুক্তি আন্দোলনের আর একটি ধারা অহিংস অসহযোগ সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তখন সারা দেশকে প্লাবিত করে চলেছে। নজরুল সে আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতায় মুগ্ধ। তিনি অনুভব করলেন তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটা মুখপত্র দরকার। কবি তখন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে নিজের বাসায় উঠে এসেছেন। বন্ধুদের নিয়ে সেখান থেকেই তিনি বার করলেন সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকা, সপ্তাহে সপ্তাহে যার অগ্নি উদ্গীরণ বিদেশী সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। সে পত্রিকারই শারদ সংখ্যার লেখার জন্য সম্পাদক কবি নজরুল ইসলামের জেল হলো এক বছরের জন্য। কবিকে হুগলী জেলে নিয়ে রাখা হলো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে।

বাঙলার নিকৃষ্টতম জেলখানা হুগলী। হৃদয়হীন তার ইংরেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কারাগারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করলে তা নিয়ে সারা বাঙলায় বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। জেলখানায় বসে আগে থেকেই নজরুল 'মরণ-বরণ', 'বন্দী-বন্দনা' ইত্যাদি গান রচনা করেন। এ দু'টি গান এবং 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট' প্রভৃতি গান গেয়ে নজরুল মাতিয়ে রাখতেন বন্দীদের। কিন্তু অনশন ধর্মঘটে ও সরকারী জুলুমে নজরুলসহ অনেক অনশন-বন্দীর যখন জীবনসংশয় হয়ে উঠলো সারা দেশে তখন গভীর উদ্বেগের ছায়াপাত হলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন নজরুলকে এই বলে তার পাঠালেন, 'Give up hunger strike, our Literature claims you.' শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি নজরুলকে উৎসর্গ করে নজরুল-বন্ধু শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন হুগলী জেলে।